মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুতে পরিতুষ্ট রেখেছেন’ *(মুসলিম হা/১০৫৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ١١، محرم و صفر ١٤٤٤هـ / أغسطس ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : দক্ষিণ কিরগিজিস্তানের ফারাগানা উপত্যকার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর ওশ-এ অবস্থিত সুলায়মানিয়া মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

অল্পে তুষ্টি
জীবনের প্রশান্তি
আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
সদ্য প্রকাশিত বই
অনলাইনে অর্ডার করুন
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়
- অল্পে তুষ্টির পরিচয়
- অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রসমূহ
- অল্পে তুষ্টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য
- অল্পে তুষ্টির উপকারিতা ও ফযীলত
- অল্পে তুষ্ট না থাকার ক্ষতিকর দিক সমূহ
- অল্পে তুষ্টি অর্জনের পথে অন্তরায়
- অল্পে তুষ্ট থাকার উপায়
- অল্পে তুষ্টির নমুনা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়
- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ (রহঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

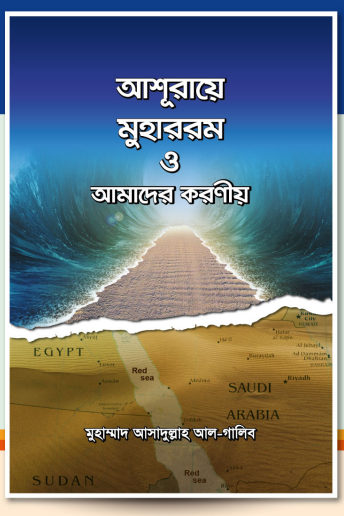

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০। ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর	১৪৪৪ হি.
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪২৯ বাং
আগস্ট	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(২য় কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার *(শেষ কিস্তি)* ০৯
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - মুসলিম শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয় ১৬
    -অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
  - বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ২০
    -ড. মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান
  - আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৬
- **মনীষী চরিত :**
  - মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা ২৮
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - অর্থমন্ত্রীরা যেভাবে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেন ৩৪
    -শওকত হোসেন
- **মনীষীদের জীবন থেকে :**
  - ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সহনশীলতা ও বিনয়-নম্রতার অনন্য নিদর্শন *-আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ৩৬
- **দিশারী :**
  - কা'বাগৃহের নীচে কবরস্থান! সংশয় নিরসন ৩৭
    -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **ক্ষেত-খামার :** ▶ ক্যাপসিকাম চাষ করবেন যেভাবে ৩৯
- **কবিতা :** ৪০
  - দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ▶ টাকা
  - সূদ-ঘুষ ▶ আহলেহাদীছ আন্দোলন
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ঘুষ-দুর্নীতি : পরিণতি ও প্রতিকার

অন্যায় পন্থায় অর্থ উপার্জনের ও স্বার্থ উদ্ধারের অন্যতম মাধ্যম হ'ল 'ঘুষ'। যা সমাজের জন্য দূর নিয়ন্ত্রিত বোমার মত কাজ করে। কেননা ঘুষ দেখা যায় না এবং এর কোন রেকর্ড থাকে না। অথচ কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল'। 'যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*। উক্ত আয়াত দু'টিতে চারটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। (১) অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করা (২) পরস্পরে হত্যা করা বা আত্মহত্যা করা (৩) সীমালংঘন করা ও (৪) অত্যাচার করা *(কুরতুবী)*। মূলতঃ ঘুষের মাধ্যমে পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মানুষ তার আত্মাকে হত্যা করে। সে সীমালংঘন করে ও নিজের উপর অত্যাচার করে। অফিসে ফাইল আটকিয়ে ঘুষ আদায় করা গা সওয়া হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীদের মুখে প্রবাদ আছে, 'অফিস-আদালতের চৌকাঠও ঘুষ খায়'।

ঘুষ ও সূদ ইহূদীদের স্বভাবজাত। মুসলমানদের মধ্যে যারা মুনাফিক, তারাও এতে অভ্যস্ত। সেকারণ উভয়কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'তারা মিথ্যা গ্রহণে যেমন অভ্যস্ত, হারাম খেতেও তেমনি অভ্যস্ত' *(মায়েদাহ ৫/৪২)*। এখানে 'সুহ্ত' বা 'হারাম' অর্থ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'ঘুষ' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২২০৯৪)*। 'লোকদের মধ্যে ঘুষের লেনদেন হারাম এবং বিচারের ক্ষেত্রে এটি কুফরী। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করেনা, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪; ত্বাবারাণী হা/৯১০০; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৫২৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, যা হারাম দ্বারা পুষ্ট' *(মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। তিনি আরও বলেন, 'ঐ ব্যক্তির দো'আ কিভাবে আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে, যার খাদ্য হারাম, পোষাক হারাম, পানীয় হারাম এবং সে হারাম দ্বারা পুষ্ট' *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

সাধারণভাবে পরস্পরকে 'হাদিয়া' দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পরস্পরে হাদিয়া দাও এবং মহব্বত বাড়াও' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। তবে অন্যায় উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য হাদিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুফারিশ করে, তার জন্য তা থেকে একটি অংশ থাকে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করে তার জন্য তা থেকে একটি অংশ থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান' *(নিসা ৪/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হাদিয়া গ্রহণ হ'ল খেয়ানত' *(ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য কোন বিষয়ে সুফারিশ করল। অতঃপর তাকে কিছু হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, ঐ ব্যক্তি সূদের একটি বড় দরজার মধ্যে প্রবেশ করল' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৪১; মিশকাত হা/৩৭৫৭)*। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে লা'নত করেছেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৭৬; আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। অন্য বর্ণনায় 'ঘুষের মাধ্যম' ব্যক্তিকে লা'নত করা হয়েছে *(আহমাদ হা/২২৪৫২; তবে এই অংশটি যঈফ)*। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছে *(শরহ আবুদাঊদ)*। অতি সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক ডিজির গাড়ী চালক ঢাকায় নিজের ও স্ত্রীর নামে ১০ কাঠা জমির উপর দু'টি ৭তলা বাড়ী, নির্মাণাধীন দু'টি ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবন, পাজেরো সহ ৩টি বিলাসবহুল গাড়ী, ১০টি প্লট ও ৪টি ফ্ল্যাট, অধিদফতরের তৈল সিণ্ডিকেটের নায়ক, গ্রামে শত বিঘা জমি এবং জানা-অজানা শত কোটি টাকার 'ড্রাইভার মালেক' এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিসাব অফিসের 'অডিটর কুতুব' তার বাস্তব প্রমাণ। অথচ তারা যাদের স্বার্থে কাজ করেছে, সেইসব রাঘব বোয়ালরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এছাড়াও দিন দিন বাড়ছে পাহাড়প্রমাণ ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের নিত্য-নতুন পিলে চমকানো খবর। এখন ব্যক্তি পর্যায়ে ঘুষের বদলে অফিস পর্যায়ে 'প্যাকেজ মানি' 'অফিস মানি' 'স্পিড মানি' ইত্যাদি নামে ঘুষের লেনদেন হচ্ছে। যার পাপে অনেকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি একটি মুসলিম দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত 'মিস্টার টেন পার্সেন্ট' নামে পরিচিতি পেয়েছেন। ঘুষ ও দুর্নীতি এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে, সর্বত্র একটা পাপের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। যা আল্লাহ্র গযবকে ত্বরান্বিত করছে। যা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে করোনা সহ নানাবিধ ভাইরাস, দাবদাহ, বন্যা ও দাবানলের মাধ্যমে। ঘুষের লেনদেনের সময় ঘুষদাতা যুক্তি দেয় যে, আমি আমার হক আদায়ের জন্য এটা দিচ্ছি। আর ঘুষ গ্রহীতা যুক্তি দেয় যে, আমি হাদিয়া নিচ্ছি। আল্লাহ বলেন, '(এভাবে) তাদের মন্দ কাজগুলিকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হয়' *(তওবা ৯/৩৭)*। অতএব সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাবধান!

৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয্দ গোত্রের ইবনুল লুৎবিয়াহকে যাকাত আদায়ের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। অতঃপর আদায় শেষে ফিরে আসার পর তিনি বলেন, 'এটি তোমাদের জন্য এবং এটি আমার জন্য 'হাদিয়া'। একথা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে যান এবং হাম্দ ও ছানার পরে সবার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আদায়কারীর কি হয়েছে যাকে আমরা নিয়োগ দিলাম। অতঃপর সে আমাদের কাছে এল আর বলল, এটি তোমাদের এবং এটি আমার জন্য 'হাদিয়া'! তাহ'লে কেন সে তার পিতা বা মাতার গৃহে বসে থাকে না? অতঃপর সে দেখুক তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমাদের যে কেউ আদায়কৃত মাল থেকে যতটুকু গ্রহণ করবে, ততটুকু ক্বিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে নিয়ে উঠতে হবে। যদিও তা উট হয়, গরু হয় বা ছাগল হয়'। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উপরে তুললেন... ও তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৭৭৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৯৯ পৃ.)*। এখানে উক্ত আদায়কারী হাদিয়াকে স্বাভাবিকভাবে জায়েয মনে করেছিলেন। কিন্তু নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে এটি তার জন্য জায়েয ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, যাকাত ও ছাদাক্বা ইত্যাদি বায়তুল মাল আদায়কারী ও হিসাব সংরক্ষণকারীর জন্য এবং যেকোন সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য তাকে প্রদত্ত বেতন-ভাতার বাইরে কোনরূপ হাদিয়া গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

ইবাদতের স্তরসমূহ :

ইবাদতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব। এর মধ্যে কিছু উম্মতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আর কিছু দলীলের ভিত্তিতে নির্ণীত। এভাবে স্তরের ভিন্নতা শরী'আত প্রণেতার সম্বোধন, নির্দেশিত বিষয় কাজে বাস্তবায়ন এবং বর্জনীয় বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ফরয বা ওয়াজিব : যে ইবাদত পালনের জন্য ছওয়াব পাওয়া যায় এবং যা পরিত্যাগকারী শাস্তির হকদার হয়। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক যাকাত দেওয়া ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি কর্তৃক হজ্জ পালন করা ইত্যাদি।

সুন্নাত : যে ইবাদত রাসূল (ছাঃ) করেছেন, করতে বলেছেন বা সমর্থন করেছেন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সংশ্লিষ্ট সুন্নাত আদায় করা, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম পালন করা, ই'তিকাফ করা ইত্যাদি।

মুস্তাহাব : যে ইবাদত করলে ছওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু পরিত্যাগকারীর শাস্তি হয় না। যেমন ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা, আযানের জওয়াব দেওয়া ইত্যাদি।

ইবাদতের রুকনসমূহ :

ইবাদতের রুকন তিনটি। যেগুলো ব্যতীত ইবাদত সিদ্ধ হয় না। সেগুলি নিম্নরূপ-

১. আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ মহব্বত :

আল্লাহ্র মহব্বত হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। যার উপর ইসলামের ইবাদতসমূহ প্রতিষ্ঠিত। দেহের সাথে মাথার যেমন সম্পর্ক, ইবাদতের সাথে আল্লাহ্র মহব্বতের তদ্রূপ সম্পর্ক। অতএব যে দেহের মাথা নেই তার প্রাণ নেই। অনুরূপ যে ইবাদতে আল্লাহ্র মহব্বত নেই সেই ইবাদত অস্তিত্বহীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহব্বত দ্বারা বিদ'আতীদের মিথ্যা মহব্বত, দার্শনিকদের কাল্পনিক মহব্বত কিংবা ছূফীদের মহব্বতের দাবী উদ্দেশ্য নয়। বরং যে মহব্বতে বিনয় এবং আল্লাহ্র মহত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায় সেটাই প্রকৃত মহব্বত। বান্দা তার সর্বাধিক প্রিয় রবের জন্য উৎসর্গ হ'তে সদা প্রস্তুত থাকবে। যা আল্লাহ পসন্দ করেন বান্দাও তা পসন্দ করবে। যা আল্লাহ অপসন্দ করেন বান্দাও তা অপসন্দ করবে। আল্লাহ্র আদেশসমূহ বান্দা প্রতিপালন করবে এবং নিষেধগুলো বর্জন করবে। আল্লাহ্র প্রিয়জনকে বন্ধু ভাববে। আল্লাহ্র শত্রুকে শত্রু গণ্য করবে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয় জানার একমাত্র পথ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ، 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

মুখে ভালোবাসার দাবী করলে এবং কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ থেকে দূরে থাকলে ক্বিয়ামত দিবসে ঐ ভালোবাসা কোন উপকারে আসবে না। এটা হবে ভালবাসার নামে আল্লাহ্র সাথে মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়ছালাকারী যে আল্লাহ্র মহব্বতের দাবী করে, অথচ সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে না, তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। যতক্ষণ না সে সকল কথা ও কাজে শরী'আতে মুহাম্মাদী এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর দ্বীনের অনুসরণ করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী 'তরজমাতুল বাব-২০; মুসলিম হা/১৭১৮)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন'। অর্থাৎ এর দ্বারা তোমরা যা চাও, তার চেয়ে বড়টা তোমাদের অর্জিত হবে। তাহ'ল তোমরা আল্লাহকে নয়, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক দাবী করে তারা আল্লাহকে ভালবাসে। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।[১]

২. আশা করা :

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে মানুষ আল্লাহ্র জন্য যেসব ইবাদত করবে, তাতে সে আল্লাহ্র কাছে ছওয়াবের আশা করবে। আর আল্লাহ্র অশেষ দান ও অগণিত অনুগ্রহে সে আনন্দিত হবে। এ অনুগ্রহ ও নে'মত সমূহের জন্যও সে আল্লাহ্র রহমত কামনা করবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ্র রহমত আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে (অর্থাৎ পার্থিব কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান চায় তার জানা আবশ্যক যে,) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময়টি আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (অর্থাৎ তিনি সকলের সব কথা শোনেন ও সকলের অন্তরের খবর জানেন)' *(আনকাবূত ২৯/৫)*।

১. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২/৩২ পৃঃ, সূরা আলে ইমরান ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

যখন বান্দা কোন গুনাহ করে বা পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন সে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হবে না এবং আল্লাহ্র ক্ষমা হ'তে হতাশ হবে না। বরং গুনাহ হ'তে মুক্তির আশায় সে দ্রুত আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، 'আমি আমার বান্দার ধারণামত হয়ে থাকি। আর আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে'।[২]

বান্দার জন্য উচিত আল্লাহ্র রহমত, ছওয়াব এবং ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে শরী'আত অনুযায়ী আমল করা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকে বাস্তবে রূপ দানের চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। কারণ সৎ আমল ছাড়া জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা করা ধোঁকাবাজী বৈ কিছুই নয়।

৩. আল্লাহ্র ভয় :

আল্লাহকে ভয় করা প্রত্যেকের উপর ফরয। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. 'নিশ্চয়ই এরাই সে শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদের থেকে তোমাদের ভয় দেখায়। কিন্তু যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তবে তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর' *(আলে ইমরান ৩/১৭৫)*। আল্লাহ্র বাণী, وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ 'আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না, আর যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী' *(মুমিনূন ৬১)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্র বাণী وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ... 'এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে ...' *(মুমিনূন ২৩/৬০)* এ আয়াত কি ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ও চোরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হে ছিদ্দীকের কন্যা! না ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং এই ভয়ে থাকে যে, যদি আমার এ আমলসমূহ কবুল না হয়'।[৩]

মুমিনদের মধ্যে সর্বদা আশা ও ভীতি বিরাজ করে। আর মুনাফিকদের মধ্যে বিরাজ করে অকল্যাণ ও বাসনা। ইসলামী শরী'আত বান্দার নিকট এমন ভীতি কামনা করে, যা তার মধ্যে ও আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ লঙ্ঘন করার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ এ সীমা অতিক্রম করলে আল্লাহ্র রহমত হ'তে হতাশা জন্ম নিতে পারে। আর আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য।

আশা ও ভীতির মধ্যবর্তী অবস্থান :

বান্দার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে আশা ও ভীতির মধ্যে অবস্থান করা। কেবল আশাহীন ভয়ের মধ্যে থাকাই নিরাশা ও হতাশা। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত' *(ইউসুফ ১২/৮৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّوْنَ. 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হ'তে কে হতাশ হয়? *(হিজর ১৫/৫৬)*।

আল্লাহভীতি ব্যতীত কেবল তাঁর রহমতের আশা করা হচ্ছে, আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার শামিল, যা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন, أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ، 'তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৭/৯৯)*। এরূপ আরো অনেক বর্ণনা এসেছে, যাতে বান্দাদের আশা ও আল্লাহ-ভীতি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আর আল্লাহ ঐ সকল লোকের প্রশংসা করেছেন, যারা উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করে চলে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا، 'তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের

২. *বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪।*

৩. *তিরমিযী হা/৩১৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৮; ছহীহাহ হা/১৬৫।*

www.at-tahreek.com

প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র কত নিকটতর হ'তে পারে। তারা তাঁর দয়া কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অতীব ভয়াবহ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৭)*। তিনি আরো বলেন, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، '(বল, শিরককারী ব্যক্তি উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি উত্তম) যে রাত্রিকালে সিজদা ও ক্বিয়ামের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে দীর্ঘ ছালাত আদায় করে। যখন সে আখেরাতকে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনা করে?' *(যুমার ৩৯/৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. 'যারা (রাত্রি বেলায়) শয্যাত্যাগ করে (তাহাজ্জুদের ছালাতে) তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সাথে' *(সাজদাহ ৩২/১৬)*।

আশা ও ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকালে বান্দার উচিত স্বীয় মনের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা। কারণ যখন আল্লাহ্র ভয় মনে অতি প্রবল হয়ে উঠে তখন তাঁর রহমত হ'তে নিরাশ হয়ে যায়। যেমন অসুখ হ'লে এবং পাপ করলে। তখন বান্দার জন্য করণীয় হ'ল উভয়ের মাঝে তুলনা করা এবং ভয়ের প্রবলতা কমানো। আর যখন আশার দিকটা প্রবল হয়ে ওঠে তখন আল্লাহ্র পাকড়াওকে পরোয়া করে না। যেমন সুস্থতা ও ইবাদত-বন্দেগী করার পর। তখন বান্দা আশা ও ভীতির মাঝে তুলনা করবে এবং আশার প্রবলতা কাটিয়ে উঠবে। যদি আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হওয়ার অথবা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে উদাসীন হবার ভয় না থাকে, তবে উভয়ের মাঝে তার সমতা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

এই তিনটি রুকনের মান নির্ণয় হয় মানুষের আত্মা থেকে। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় উদাহরণত পাখীর মত। মহব্বত তার মাথা, আশা এবং ভয় তার দু'টি ডানা। যখন মাথা এবং ডানা দু'টি ভালো থাকবে, পাখীর উড্ডয়নও ভালো হবে। মাথা কেটে ফেলা হ'লে পাখীর মৃত্যু ঘটবে। আর দু'টি ডানা নষ্ট হ'লে পাখিটি শিকারীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। বান্দার উচিত এই তিনটি রুকন সম্মিলিতভাবে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানো। একটা বা দু'টার প্রতিফলন ঘটানো ও বাকীটা বর্জন বৈধ নয়।

বস্তুত: আল্লাহ্র ভয় ছাড়া মহব্বত সামান্য কিছু পাপ থেকে বাঁচাতে পারে। আশাহীন ইবাদত মিথ্যা দাবী মাত্র। এজন্য যারা ভয় করে না, শুধু মহব্বতের দাবী করে তারা বেপরোয়া গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। যেমন ইহুদী সম্প্রদায়। তারা বলে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، 'আমরাই আল্লাহ্র সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন' *(মায়েদাহ ৫/১৮)*। অথচ তারা পাপ কাজে সারা পৃথিবীর শীর্ষে। এজন্য আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, বল, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، 'তাহ'লে তোমাদের পাপাচারের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন কেন'? *(মায়েদাহ ৫/১৮)*।

এমনিভাবে শুধুমাত্র আশা করার মধ্যে শিথিলতার জন্ম দেয়। এক পর্যায়ে সে আল্লাহ্র কৌশলকে আল্লাহ্র পক্ষে তার জন্য আশ্রয় মনে করে এবং পাপাচার ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। আবার শুধু ভীতি বান্দাকে নিরাশ এবং হতাশার দিকে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে ভুল ধারণা জন্ম দেয়। অতএব বান্দা তার ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল কাজে আল্লাহ্র মহব্বত, আশা ও ভীতির সম্মিলন ঘটাবে এবং এটাই তাওহীদ ও ঈমান।

ইসলামে ইবাদত সঠিক হওয়ার শর্তাবলী :

১. উদ্দেশ্য শরী'আত সম্মত হওয়া :

কোন মানুষ যদি এমন কোন ইবাদত করে যা শরী'আত সাব্যস্ত করেনি অর্থাৎ যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নির্দেশনা নেই, তাহ'লে সে ইবাদত পরিত্যাজ্য। যেমন মীলাদুন্নবী উদযাপন করা এবং ২৭শে রজব রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-এর ইসরা ও মি'রাজ হয়েছিল দাবী করে সে রাত্রে ইবাদত করা। এসব শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, বিধায় এসব ইবাদত পরিত্যাজ্য।

২. বস্তু শরী'আত সম্মত হওয়া :

ইবাদতের ক্ষেত্রে যেসব বস্তু শরী'আত সম্মত নয়, সেসব দ্বারা ইবাদত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কেউ যদি ঘোড়া কুরবানী করে তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা শরী'আতে চার ধরনের পশু কুরবানী করার কথা এসেছে। তাহ'ল উট, গরু, ছাগল, দুম্বা *(আন'আম ৬/১৪৩-৪৪)*। ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করা শরী'আতে অনুমোদিত নয়। তাই কেউ ঘোড়া কুরবানী করলে তা কবুল হবে না।

৩. পরিমাণ শরী'আত সম্মত হওয়া :

ইবাদতের ক্ষেত্রে শরী'আত নির্ধারিত পরিমাণে কম-বেশী করলে ইবাদত হয় না এবং আল্লাহ্র কাছে তা কবুল হয় না। যেমন কেউ যদি দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ক্ষেত্রে ছয় ওয়াক্ত কিংবা যোহর, আছর ও এশার চার রাক'আতের পরিবর্তে ছয় রাক'আত, মাগরিবে তিনের বদলে চার এবং ফজরে দুইয়ের স্থলে চার পড়ে তাহ'লে তা কবুল হবে না। কেননা তা শরী'আত নির্ধারিত পরিমাণ নয়। অনুরূপভাবে যিকরের ক্ষেত্রে ফরয ছালাতের পর ৩৩ বারের স্থলে ৫০ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়লে তা ইবাদত হবে না। কেননা এই পরিমাণ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়।

৪. পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হওয়া :

ইবাদতের পদ্ধতিও শরী'আত সম্মত হ'তে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পদ্ধতির বাইরে কেউ কোন ইবাদত করলে তা ইবাদত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কেউ যদি ওযূ করার ক্ষেত্রে আগে পা ধৌত করে অতঃপর মাথা মাসাহ করে, তারপর দু'হাত ধৌত করে এবং শেষে মুখমণ্ডল ধৌত করে তাহ'লে এটা ইবাদত হবে না। কেননা এটা শরী'আত প্রদত্ত পদ্ধতি নয়।

৫. সময় শরী'আত সম্মত হওয়া :

ইসলামী শরী'আত যে ইবাদতের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার বাইরে গিয়ে ইবাদত করলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। যেমন কেউ যদি রামাযানের ফরয ছিয়াম শা'বান বা শাওয়াল মাসে রাখে অথবা কেউ যদি মুহাররম বা যিলক্বদ মাসে হজ্জ করে তাহ'লে তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। অতএব বলা যায় যে, নির্ধারিত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত ঐ সময়ের বাইরে আদায় করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

৬. স্থান শরী'আত সম্মত হওয়া :

শরী'আত যে ইবাদতের জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে তার বাইরে সেই ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে আরাফায় অবস্থান না করে মুযদালিফায় অবস্থান করলে কিংবা বাড়ীতে ই'তেকাফ করলে তা কবুল হবে না। কেননা হজ্জের প্রধান রুকন হ'ল আরাফায় অবস্থান করা। অনুরূপভাবে ই'তেকাফ করতে হয় মসজিদে, বাড়ীতে নয়।

ইবাদতের বৈশিষ্ট্য :

১. ইবাদতে একনিষ্ঠতা : ইবাদত কেবল আল্লাহ্র জন্য হ'তে হবে শিরকমুক্তভাবে *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। কেননা আল্লাহ তা'আলা এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন।

২. ইবাদত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে নির্ভরশীল : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখ নেই এমন কোন ইবাদত করা বান্দার জন্য জায়েয নয়।

৩. বান্দা ও স্বীয় রবের মাঝে কোন মাধ্যম নেই : মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য ও তাঁর নিকটে দো'আ করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. ইসলামের ইবাদতসমূহ সরলতার উপরে প্রতিষ্ঠিত : ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের ক্ষেত্রে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি তথা শক্তি-সামর্থ্য, দুর্বলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, অবসাদ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণীত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবাদত সমূহও সরলতা, সহজতা ও ক্ষমার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

ইবাদত কবুলের শর্তাবলী :

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত তিনটি। এ শর্তগুলো ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

(১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (عقيدة صحيحة) (২) তরীকা সঠিক হওয়া (طريقة صحيحة) এবং (৩) ইখলাছে আমল (إخلاص عمل)। অর্থাৎ শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস, ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ এবং শ্রুতি ও প্রদর্শনীমুক্ত ইখলাছ, এই তিনটির সমন্বয় ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে বান্দার কোন সৎকর্মই কবুল হবে না এবং তাতে কোন ছওয়াবও সে পাবে না।

(১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া :

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য আক্বীদাহ ছহীহ হওয়া অতি যরূরী। কেননা আক্বীদাহ বাতিল হ'লে ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

আক্বীদার বিষয়টিকে হাদীছেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ৫টি ভিত্তির মধ্যে আক্বীদা বা ঈমানই হচ্ছে প্রধান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'পাচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিতঃ (১) এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, (২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৪] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর অর্পিত'।[৫] আপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ

৪. বুখারী হা/৪; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৩।
৫. মুসলিম হা/২১।

أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামনে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যেক দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে আর তাদের দরিদ্রদেরকে প্রদান করা হবে'।[৬]

আক্বীদা সঠিক থাকলে কোন গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান করবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি যে জীবনে কখনো কোন প্রকার ছওয়াবের কাজ করেনি, যখন সে মারা যাবে তার পরিবার-পরিজনকে ডেকে বলল, মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলে সেটার অর্ধেক ছাই স্থলভাগে (বাতাসে উড়িয়ে) দিবে এবং অর্ধেক পানিতে নিক্ষেপ করবে। কারণ আল্লাহ্র কসম! আমাকে যদি আল্লাহ ধরতে পারেন তাহ'লে তিনি আমাকে অবশ্যই এমন আযাব দিবেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে কখনো দেননি। তারপর লোকটি যখন মৃত্যুবরণ করল তখন তার পরিবারের লোকেরা তার নির্দেশ অনুযায়ী তাই করল। তখন আল্লাহ স্থলভাগকে আদেশ দিলে সে তার মধ্যস্থিত যা কিছু আছে (ছাই) একত্রিত করল। এরপর পানিতে মিশ্রিত ভাগকে নির্দেশ দিলেন। সেও তার মধ্যস্থিত সবকিছু একত্রিত করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ কেন করলে? সে বলল, হে আমার রব! আপনার ভয়ে। আপনি তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।[৭]

সঠিক আক্বীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. 'জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ বলবেন, যার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের কর'।[৮]

ছাহাবায়ে কেরাম এজন্য আক্বীদা তথা ঈমানকে কুরআন শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিতেন। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا. 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নব যুবক ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে এর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমাদের সময়ে আমরা কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আগে প্রথমে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতাম এবং যখন সূরাগুলো নাযিল হ'ত তখন আমরা শিখে নিতাম সেখানে কি বৈধ আর কি অবৈধ, কি করা নিষিদ্ধ আর কি করতে সূরাগুলো নির্দেশ করছে। আর সেগুলোর প্রতি আমাদের করণীয় কি তাও আমরা শিখে নিতাম। কিন্তু আমি অনেককেই দেখছি যাদেরকে ঈমান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার আগেই কুরআন দেওয়া হচ্ছে আর সে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে অথচ সে জানে না এর (কুরআনের) আদেশগুলো কি কি, নিষেধগুলো কি কি এবং সে সম্পর্কে করণীয়গুলোই বা কি কি। সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে খেজুরগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে (অর্থাৎ সে তার কুরআন পড়া থেকে কোন উপকার পাচ্ছে না)।[১০]

[ক্রমশঃ]

সংশোধনী : *মুদ্রণ প্রমাদজনিত কারণে গত সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষে নিম্নের অংশটুকু বাদ পড়েছে,*

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আর ছালাত প্রতিষ্ঠা...

অনবধানতাবশত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক।

৬. *বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।*

৭. *মুসলিম হা/২৭৫৬; মিশকাত হা/২৩৬৯।*
৮. *বুখারী হা/৬৫৬০; মিশকাত হা/৫৫৮০।*
৯. *ইবনে মাজাহ হা/৬১, সনদ ছহীহ।*
১০. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১০১; সিলসিলা আছারুছ ছহীহাহ আ/১৫৭।*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

৭ম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর আধাআধি ভাগে ফসল করার জন্য সেখানকার ইহূদীদের সঙ্গে চুক্তি হয়। পরে চুক্তি অনুযায়ী ফসলের ভাগ আনার জন্য ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)-কে পাঠানো হয়। এ সময় ইহূদী নেতারা তাদের নারীদের স্বর্ণালঙ্কার সমূহ এনে বলে, এগুলি আপনার জন্য। আপনি দয়া করে ভাগ-বণ্টনে কিছুটা হালকা করুন। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে ইহূদী জাতি! আল্লাহ্র কসম, তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। ...তোমরা আমার নিকটে ঘুষের যে প্রস্তাব দিয়েছ, সেটি সুহ্ত বা হারাম। আমরা এটা খাইনা। তখন তারা বলল, এই ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই আসমান ও যমীন টিকে থাকবে' *(বায়হাক্বী ৪/১২৩, হা/৭৬৮৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, হে বানর-শূকরের বংশধরগণ'... *(বায়হাক্বী ৬/১১৪, হা/১১৯৬০)*।

খায়বর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম মিদ'আম একটি অজানা তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। তাতে সবাই তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে প্রশংসা করতে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, গণীমত বণ্টন হওয়ার পূর্বেই সে যে চাদরটি নিয়েছিল সেটি অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। এ কথা শুনে যারা এমনকি জুতার একটা বা দু'টা ফিতাও নিয়েছিল, সেগুলি জমা দিল। এটা দেখে তিনি বললেন, এই একটা বা দু'টা ফিতাও হয়ে যেত আগুনের ফিতা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৯৯৭)*।

পরিণতি ও প্রতিকার : মাত্র দু'টি। ঈমান ও আল্লাহভীতি এবং ন্যায়বিচার ও সুশাসন। কোন শাসনই কখনো নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে না, যদিনা সেখানে আল্লাহভীতি থাকে। কেননা দল ও ব্যক্তিভীতি কখনো মানুষকে অন্যায় থেকে ফেরাতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়বিচার ও সুশাসন দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং পরস্পরের পরিপূরক। বর্তমানে কোনটাই যথার্থভাবে নেই। ব্যাংক জালিয়াতি মামলার আসামী ঠাকুরগাঁওয়ের আবু সালেক-এর বদলে পাটকল শ্রমিক টাঙ্গাইলের জাহালমকে দুদকের দেওয়া ৩৩টি মিথ্যা মামলায় সাড়ে তিন বছরের অধিক বিনা দোষে কারা নির্যাতন করা, ঢাকার নয়া পল্টনের ব্যাংক কর্মকর্তা বর্তমানে ৯০ বছরের অতি বৃদ্ধ আরব আলীর ৩৮ বছর পূর্বেকার মামলার বিচার আজও শেষ না হওয়া এবং সেই সাথে র‍্যাব ও পুলিশী হেফাযতে মৃত্যুর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা দেশে সুশাসন ও ন্যায়বিচার না থাকার সর্বসাম্প্রতিক প্রমাণ।

আল্লাহ বলেন, 'আখেরাতের এই গৃহ আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় কামনা করে না। বস্তুতঃ শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*। এটি ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটি চিরন্তন বিধান। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশমুখে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে এই আয়াতটির ইংরেজী অনুবাদ ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ আছে। অথচ ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে গ্রীক দেবী থেমিসের ভাস্কর্য *(নাঊযুবিল্লাহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র যেকোন একটি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা একটি জনপদে ৪০ দিন বৃষ্টি হওয়ার চাইতে উত্তম' *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৭; মিশকাত হা/৩৫৮৮)*। তিনি মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা আল্লাহ্র দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়ন কর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর। আর এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদ যেন তোমাদেরকে বাধা না দেয়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৩৫৮৭)*।

ঘুষ-দুর্নীতি-নরহত্যা, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, অন্যের মাল আত্মসাৎ ইত্যাদি যেকোন হারাম কাজে যুক্ত ব্যক্তি ও দায়িত্বশীলদের ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাকে মুসলমানদের কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে খেয়ানতকারী অবস্থায়, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৬)*। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ বৈ কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অতঃপর বান্দার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সর্বশেষ আসমানী তারবার্তা : 'তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মফল পুরোপুরি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। অতএব দেশে সুশাসন কায়েম করুন এবং সৎলোকদের পুরস্কৃত করুন! *(স.স.)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ সাল থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই-পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই বইপত্রের মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি দেশের অন্য সবকিছুর সাথে সাথে কাগজ-কালি সহ প্রেস সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে বই-পুস্তক সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিটি বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। হাদীছ ফাউণ্ডেশনের খেদমতের তুলনায় এ মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের মনোকষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। অনাকাঙ্খিত এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। *-সচিব।*

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার

মূল (আরবী) : ড. সুলায়মান আর-রুহাইলী

*-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট অধঃপতনের আরেক মাধ্যম : গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট যে কি সাংঘাতিক, তা আপনি জানেন কি? অনেক গণমাধ্যম তার সকল উপকরণসহ আজ অধঃপতনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইয়েরা, কোন কোন গণমাধ্যমের কাজই হ'ল কামনা-বাসনার রগরগে বর্ণনা তুলে ধরা, মানুষের মনে যৌন সুড়সুড়ি উস্কে দেওয়া, প্রণয় ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, সমাজ থেকে লজ্জা-শরম উঠিয়ে দেওয়া, যারা লজ্জা-শরম মেনে চলে তাদের নিন্দা করা, যুবকরা যাতে অপরাধ ও অবক্ষয়মূলক কাজের অনুশীলনে মেতে ওঠে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করা, তারা যাতে পরস্পরে মিলে সমাজ ও চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠান করে তাদের জন্য সে ধরনের অনুষ্ঠানের রূপরেখা তুলে ধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহ আমাদের এ জাতীয় আচরণ থেকে হেফাযত করুন!

কোন কোন গণমাধ্যমের কাজ হ'ল মানুষের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করা, তাদের মন খারাপ করে দেওয়া, তাদের মনে হিংসার চাষ করা এবং এমন সব রীতি-নীতি চালু করা, যা মানুষের অন্তরকে ইসলাম থেকে বিগড়ে দেয়। মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যে পথ বুঝেছিলেন এবং মেনে চলেছিলেন উম্মতের সালাফগণ। এসব গণমাধ্যম সর্বদা কিছু লোকের দিকে, কিছু গ্রন্থের দিকে এবং কিছু নতুন নতুন চিন্তা ও দর্শনের দিকে আহ্বান জানায়। যার দ্বারা প্রভাবিত যুবসমাজ নিজেদের সমাজ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় আলেম ও শাসক শ্রেণীকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। রাজনীতির নামে কিংবা ধর্মের নামে তারা এমন করে থাকে।

কিছু গণমাধ্যম তো ঈমান-আক্বীদার গোড়া কাটায় ব্যস্ত। যাদু-টোনা, রাশিফল, আপনার ভাগ্য আজ কেমন যাবে, নক্ষত্রের সাহায্যে কিভাবে আপনার ভবিষ্যৎ জানবেন ইত্যাদি খারাপ বিষয় প্রচার করা তাদের কাজ।

আমার ভাইয়েরা! মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত ইন্টারনেট আরেকটি প্রচার মাধ্যম। এই প্রচার মাধ্যমের সার্চ ইঞ্জিন সংখ্যাও অনেক। এসব সার্চ ইঞ্জিন বহুলাংশেই অপরাধ ও অবক্ষয়ের দিকে উঁচু স্বরে আহ্বান জানায়। ইন্টারনেটের কোন কোন মাধ্যম প্রচুর সংখ্যায় অবৈধ প্রণয়-প্রীতি ও কামনা-বাসনার কথা প্রচার করে। এর ফলে বহু মানুষ অধঃপতনের শিকার হ'তে থাকে। কোন কোন মাধ্যম প্রচুর পরিমাণে বাতিল চিন্তা ছড়িয়ে দেয়। সেখানে মিলে অজ্ঞাত পরিচয় লোকদের বহু লেখালেখি, অজ্ঞাতনামা লোকদের অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি ও ফৎওয়া ইত্যাদি। আফসোস আমার ভাইয়েরা! আজ অনেক যুবক ইন্টারনেটের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত। তারা ইন্টারনেটে প্রচারিত সেসব বিষয় খুবই পসন্দ করে। সেগুলো কে বলেছেন তার নাম জানা নেই, অথবা জানা গেলেও সেই লোকই যে তা বলেছেন, অন্য কেউ বলেননি তা নিশ্চিত নয়, আবার তিনি যে ইসলামের শত্রু না মিত্র তাও জানা যায় না।

ভাইয়েরা আমার! আজ অনেক যুবকই ইন্টারনেটে উপস্থাপিত কথা খুব পসন্দ করে, অথচ তারা বিশ্বস্ত আলেমদের কথা গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, বিশ্বস্ত আলেমগণ রচিত গ্রন্থ মানতে তারা প্রস্তুত নয়। এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। আমাদের কর্তব্য এ ব্যাধির চিকিৎসা গ্রহণের কথা জোরেশোরে বলা। এ ব্যাধির চিকিৎসা হিসাবে বলব, যাদের অন্তরে যথার্থ মর্যাদাবোধ আছে, যারা কল্যাণের পথের পথিক, যারা গণমাধ্যম সম্পর্কে অবহিত, যারা মুসলিম উম্মাহকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্র দেখানো ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর চলতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই গণমাধ্যমের এই ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই প্রচার মাধ্যমে এমন কথা তুলে ধরতে হবে যা হবে গঠনমূলক, যা ধ্বংসাত্মক হবে না; উম্মাহকে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ করবে, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করবে না। সুন্নাহ আমলে নেওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানাবে, সুন্নাহ থেকে তাদের মন বিগড়ে দেবে না। দ্বীনী প্রোগ্রামে যারা আলোচনাকারী তাদের এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরকারী।

তাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, আজ তারা কথা বলছে, বই-পুস্তক ইত্যাদি লিখছে, আগামীকাল তাদেরকেই প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সেদিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে। সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল সরল মন নিয়ে যে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবে সেই ফায়েদা লাভ করবে। তাদের আরো জেনে রাখতে হবে যে, শরী'আতের আলোকে জনমানুষের উপকার সাধন, যে ধরনের কথায় তাদের কল্যাণ হবে তা তাদের সামনে তুলে ধরা তাদের জন্য অবধারিত ও নির্ধারিত ফরয। জনগণ তাদের পিছনে আসুক কিংবা না আসুক এবং তাদের কথা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হোক কিংবা না হোক, সর্বাবস্থায় তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে। গণমাধ্যমের আলোচকমাত্রই নিম্নের হাদীছের বাস্তবায়ন তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ‘যে ব্যক্তি

* *ঝিনাইদহ।*

www.at-tahreek.com

ইসলামের মধ্যে ভাল কোন কাজ চালু করবে সে তার এ কাজের ছওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার দেখে এ কাজ করবে তাদের ছওয়াবও সে পাবে। তবে এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস পাবে না। আর যে ইসলামের মধ্যে মন্দ কোন কাজ চালু করবে ঐ মন্দ কাজের পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং তার পরে যারা তার দেখে ঐ কাজ করবে তাদের সে কাজের পাপের বোঝাও তার উপর বর্তাবে। তবে এতে তাদের পাপ হ্রাস পাবে না'।[১]

সুতরাং যিনি আলোচনা করেন তিনি যেকোন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রচার মাধ্যমে আলোচনাকালে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, তিনি যদি লোকজনকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানান তাহ'লে তিনি কল্যাণ লাভ করবেন এবং একের পর এক আগত কল্যাণের সুসংবাদ লাভ করবেন। পক্ষান্তরে কোন আলোচক যদি ভ্রান্ত কোন কথা কিংবা কাজের দিকে আহ্বান জানান, আর যদিও লোকেরা তার সে কথা কিংবা কাজকে খুব চমৎকার ভাবে, যদিও লোকেরা সেই কথা কিংবা কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং যদিও প্রচুর লোক তাতে অংশ নেয় তবুও তার মনে রাখতে হবে যে, এ আলোচনার মাধ্যমে তিনি নিজের কাঁধে এমন বোঝা চাপাচ্ছেন যা বহনের ক্ষমতা তার নেই। এর ফলে বস্তুত তিনি নিজের উপর একের পর এক অথৈ ভ্রান্তি তুলে নিচ্ছেন। আর নানাজনে তার কথিত ভ্রান্তপথ অবলম্বনের কারণে ক্বিয়ামত দিবসে তিনি এমন অবস্থায় হাযির হবেন যে, সেই নানাজনের ভ্রান্তির পর ভ্রান্তির দায় নিজ কাঁধে বয়ে বেড়াবেন।

কাজেই কোন মুসলিম যখন গণমাধ্যমে কিংবা অন্য কোথাও কথা বলবেন তখন তাকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করে কথা বলতে হবে। হাশরের ময়দানের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থানক্ষেত্রের কথা তার চোখের সামনে জাগরূক রাখতে হবে। কথা বলার সময় তার চোখের উপর আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সে দৃশ্য ভাসবে, যখন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, কি কি কথা তিনি বলেছিলেন এবং কি কি কাজ করেছিলেন? যদি তিনি তার কথার সমর্থনে আমাদের রবের কিতাব থেকে এবং আমাদের রাসূলের সুন্নাহ থেকে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুসারে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন তবেই যেন তিনি আলোচনা করেন, নচেৎ চুপ থাকাই হবে তার জন্য শ্রেয়। আল্লাহ্র কসম! একাকী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন, যাকে কেউ জানে না, চিনে না, যার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না তার জন্য ঐ জীবন-যাপন থেকে অনেক শ্রেয় যে জীবনে প্রচুর খ্যাতি অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে গিয়ে অর্জিত হয়েছে।

প্রিয় ভাই আমার! আপনি বরং আপনার আলোচনায় প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সমাজে যে দ্বীনী মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা করুন। ঈমানের পথে অবিচল থাকার সঠিক উপায়-উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করুন। আপনার আগ্রহ থাকবে ঈমানের পথে অবিচল থাকার উপকরণসমূহ যাতে ঘরে ঘরে প্রচুর বিদ্যমান থাকে সে চেষ্টা করা এবং আপনার আগ্রহ থাকবে যেন আল্লাহ্র দেখানো পথের উপকরণও ঘরে ঘরে মওজূদ থাকে সে উপায় বাতলানো।

ভাইয়েরা আমার! সংখ্যাগরিষ্ঠ খারাপ লোকের অনুসরণ করা এবং অধিকাংশ লোক যেহেতু এ মতাদর্শের অনুসারী সেহেতু তা ভাল না হয়ে পারে না বলে হুজ্জতি করা যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। অনেক যুবককেই দেখা যায়, তারা একটা কিছু করে এবং তার পিছনে একটা খেয়াল কিংবা একটা চিন্তা গড়ে তোলে। কেননা সে দেখে, সমাজে অধিকাংশ লোক ঐ একই কাজ করে। সে দেখে, অধিকাংশ যুবক ঐ খেয়ালের উপর রয়েছে। সে দেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ঐ মত মেনে চলছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ-

'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দা! যদি আপনি ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের মত অনুসরণ করেন, তাহ'লে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপদগামী করে ছাড়বে। তার আলামত এই যে, তারা না হেদায়াতের অনুসরণ করে, না বাহ্যিক দলীলের। তারা অনুসরণ করে ধারণার, অনুসরণ করে নানা মতের, অনুসরণ করে বিভিন্ন চিন্তাদর্শনের, অনুসরণ করে বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের, যা কুরআন-সুন্নাহ্র বিপরীতে কোন ব্যক্তিবিশেষের খাড়া করা রীতি। তারা কেবল আন্দায-অনুমানের পিছনে ছোটে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 'আর তুমি যতই আকাংখা করোনা কেন অধিকাংশ লোক ঈমানদার হবে না' *(ইউসুফ ১২/১০৩)*।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, সম্মানিত তাবেঈ ওমর বিন মায়মূন একবার আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে জামা'আতের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ- 'হক-এর অনুগামী দলই জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও'।[২] শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যখন তুমি ন্যায়ের পথে থাকবে তখন তুমি নিজেই হবে জামা'আত। সুতরাং জামা'আত তারাই যারা আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং পূর্বসূরি নেককার ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের কার্যধারা মেনে চলে'। শায়খ

১. *মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।*

২. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, সনদ ছহীহ; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৭৩; লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ১/১২২, হা/১৬০।*

বিন বায (রহঃ)-এর কথা এখানেই শেষ।

অতএব জামা'আত, কল্যাণ ও ইস্তিক্বামাত বা দৃঢ় পথের আশ্রয় গ্রহণ অর্থ আপনি হকের উপর ন্যায়ের উপর থাকবেন, তাতে আপনি অল্প সংখ্যক লোকের সঙ্গে থাকুন না কেন। কেননা হক ও ন্যায়ই হচ্ছে ইস্তিক্বামাত বা সুদৃঢ় পথ।

আবেগতাড়িত হওয়া এবং কল্যাণকর ক্ষেত্রে আবেগকে আবদ্ধ না রেখে লাগামছাড়া আবেগ পোষণ যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। তাই দেখা যায় অনেক যুবক আবেগতাড়িত হয়ে প্রেম-ভালবাসার নামে কামনা-বাসনার জোয়ারে হাবুডুবু খায়। কেউ কেউ বুদ্ধি-বিবেক না খাটিয়ে শুধুই আবেগের বশে ইসলামের উপর নানা সন্দেহ আরোপ করে। যুবকরা এতটাই আবেগ মথিত যে, তাদের মনে আবেগ প্রায়শ উথলে ওঠে এবং তারা আবেগ দ্বারা চালিত হ'তে চায়। আবেগ মানুষের মনের এক ধরনের ঝড়, যে ঝড় মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে অনুশোচনা ও অধঃপতনের উপত্যকায় নিক্ষেপ করে। আমার ভাইয়েরা, আবেগ কিন্তু মানুষের একটি প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষের ভিতর তার অস্তিত্ব প্রশংসার কারণও বটে। কিন্তু যখন তা বিবেককে অকার্যকর করে দেয়, কিংবা শরী'আতের উপর কর্তৃত্ব করে তখনই আবেগের ভূমিকা নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

ভাইয়েরা! এর প্রতিকার হিসাবে প্রত্যেক যুবককে তার আবেগের উপর বিবেককে স্থান দিতে হবে। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আবেগকে বেঁধে রাখতে হবে এবং বিবেককে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শরী'আতের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সুতরাং বিবেক যাতে বাধা দেয় আবেগ তার দিকে আহ্বান জানালেও সেদিকে পা তোলা যাবে না। আবার শরী'আত যার অনুমোদন দেয় না, বিবেক সেদিকে ডাকলেও তার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

শব্দ হেরফের করে তাকে অযথা, অমূলক ও অন্যায্য অর্থে ব্যবহারের ফলেও যুবসমাজ অধঃপতিত হচ্ছে। এমন কিছু শব্দ আছে যা উপর উপর অনেক মধুর মনে হ'লেও ভিতরে ভিতরে তা সাক্ষাৎ বিষ- সেসব শব্দেও বহু যুবক প্রতারিত হয়। যেমন, কাফের বানানোর কাজে মশগূল লোকদের মুখে নিজেদের কর্ম-পদ্ধতির নাম 'মানহাজে-তাওহীদ বা তাওহীদমূলক কর্ম-পদ্ধতি বলে উল্লেখ অথবা 'মানহাজে-কুফর' বা কুফর জাতীয় কর্ম-পদ্ধতির স্থলে 'সালাফী মানহাজ' বা পূর্বসূরিদের কর্ম-পদ্ধতি শব্দের ব্যবহার। এগুলো শরী'আত সম্মত নয় বরং ধ্বংসাত্মক। 'মানহাজে তাওহীদ বা তাওহীদমূলক কর্ম-পদ্ধতি', 'সালাফী মানহাজ বা পূর্বসূরিদের কর্ম-পদ্ধতি' ইত্যাদি শব্দ মুসলিমদের নিকট খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু এসব শব্দ তো 'মানহাজে-কুফর বা কুফর জাতীয় কর্ম-পদ্ধতি' থেকে মুক্ত। তাই কুফরী মানহাজের ধারক-বাহকরা যখন তাদের মানহাজকে তাওহীদী মানহাজ কিংবা সালাফী মানহাজ বলে উপস্থাপন করে তখন যুবক-বৃদ্ধ যে কেউ প্রথম প্রথম তাকে সঠিক মানহাজ বলে প্রতারিত হ'তে পারে। পরে সত্য উন্মোচিত হ'লে তখনই কেবল মুখে মধু অন্তরে বিষ প্রমাণিত হবে।

অনেকে নিজেদের জন্য 'মধ্যপন্থী' শব্দ ব্যবহার করে। মধ্যপন্থী বলে তারা শারঈ অনেক ফরয নিজেরা পালন করে না অথবা শারঈভাবে হারাম অনেক কাজে তারা জড়িত হয়। এভাবে বর্জন ও গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের লিবারেল মুসলিম পরিচয় দেয় এবং তাদের বিপরীতে যারা ইসলামকে সামগ্রিকভাবে পালন করে তাদেরকে কোন ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বিশেষণে আখ্যায়িত করে। উম্মাহ্র স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল বক্তব্যকে যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝ আঁকড়ে ধরতে যারা আহ্বান জানান, কিংবা যারা সুন্নাহ মেনে চলতে আহ্বান জানান, সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে আরোপিত আপত্তি-অভিযোগ খণ্ডন করেন এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক করেন তাদেরকে 'রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা হেয়কারী' নামে আখ্যায়িত করাও শব্দ হেরফের করার অন্তর্ভুক্ত। ভাইয়েরা আমার, এহেন ধোঁকাপূর্ণ শব্দ একটা দু'টা নয়। এ ধরনের শব্দে বহু যুবকই প্রতারিত হয়। তারা বুঝতেও পারে না যে, কোন কথায়, কোন আচরণে নিজেদের অজান্তেই তারা ধোঁকায় ফেঁসে গেছে।

তাদের অনেকে দর্শন-চিন্তার পাকচক্রে আপতিত হয়, যে দর্শন-চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে নানা রকম সন্দেহ। এহেন বড়-সড় চক্রান্তে পড়ে তারা সুন্নাহ্র অনুসারীদের ঘৃণা করতে শুরু করে, আর শয়তান ও বাতিলপন্থীরা এ কাজে তাদের মদদ যোগায়।[৩]

---

৩. *আমাদের সমাজে ইসলাম ও মুসলিমদের কেন্দ্র করে এমন বেশ কিছু গর্হিত ও অন্যায় শব্দ চালু আছে। যারা ইসলামী আইন-কানূন মেনে চলতে চেষ্টা করেন, ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার মোকাবিলা করেন তাদের বিরুদ্ধে 'মৌলবাদী', 'সাম্প্রদায়িক', 'ধর্মান্ধ', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'প্রগতি বিরোধী', 'ওহাবী', 'গোঁড়া', 'চরমপন্থী', 'উগ্রপন্থী', 'কট্টরপন্থী', 'জিহাদী', 'জঙ্গী', 'পশ্চাৎপদ' ইত্যাদি শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যারা নামে মুসলিম কিন্তু ইসলামী বিধিবিধান ঠিকমতো মেনে চলেন না তারা তো ধার্মিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের শব্দ ব্যবহারকে পোয়াবারো মনে করেন। আর যারা দ্বীন-ধর্ম যথাসাধ্য পালন করেন; কিন্তু এ ধরনের গালিসূচক শব্দের শিকার হ'তে চান না তারাও যাদের বিরুদ্ধে এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলেন। ফলে সত্য জানার পরেও বহু তরুণ-যুবক দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়ে থাকে। কাজেই শব্দ হেরফের করে তাকে গর্হিত, অমূলক ও অন্যায্য অর্থে ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। কোন শব্দ শয়তানীমূলক, কোন শব্দ আল্লাহ্র নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এবং কোন শব্দ আল্লাহ্র পথে থাকার দলীল বহন করে তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। বাতিলপন্থীদের শব্দের কুহক থেকে আমাদের অবশ্যই বাঁচতে হবে। মনে রাখতে হবে কাউকে অন্যায়ভাবে গালিসূচক শব্দ ব্যবহার করলে তার অন্তর যেভাবে আহত হয় তা তলোয়ারের আঘাত থেকেও মারাত্মক। জনৈক কবি বলেছেন,*

جراحات السنان لها التئام ... ولا يلتام ما جرح اللسان

'তলোয়ারের সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় হয়, কিন্তু মুখের ভাষা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় হয় না'। তাই গালি ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের ভয়ে অনেক যুবক সত্যকে জানার পরেও তা গ্রহণে এগিয়ে আসে না। এ ধরনের গর্হিত ও অন্যায় শব্দ ব্যবহারকারীরা কিন্তু নিজেদের যথার্থ ও ভাল মানুষ বুঝাতে 'মুক্তবুদ্ধিচর্চাকারী', 'মুক্তচিন্তাশীল' 'মুক্তমনা', 'প্রগতিশীল', 'আধুনিকতামনস্ক', 'উদার নৈতিকতাবাদী', 'অসাম্প্রদায়িক', 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষে ছাফাই গান। এরা ইসলামপ্রিয় সরল মানুষদের প্রতারণা করতে প্রায়শই বলে থাকেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার', 'সংস্কৃতি ও ধর্ম আলাদা, ধর্মের নামে সংস্কৃতির উপর আঘাত

আমার যুবক ভাইয়েরা! আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমন কোন শব্দ কানে শোনামাত্রই যেন আমরা তা লুফে না নেই। বরং আমরা এসব শব্দ বাজিয়ে দেখব, তার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হব এবং উম্মাহ্র পূর্বসূরি জ্ঞানীগুণীদের বুঝের আলোকে তা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনা শরী'আতের সাথে মিলিয়ে দেখব। তারপর সঠিক হ'লেই কেবল তা আমরা মানব, সঠিক না হ'লে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলব।

যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ কাজে-কর্মে তাড়াহুড়া করা, ধীরতা অবলম্বন না করা। অনেক যুবকের কাজে ধীর-স্থিরতা থাকে না, তারা তাদের কাজ-কর্ম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে না এবং কাজের ফলাফল কী দাঁড়াবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তাড়াহুড়া করে কাজের দরুন আখেরে তাদের পস্তাতে হয়। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ছাহাবী সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ 'ধীরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে'।[৪] আমাদের আলেমগণ বলেছেন, তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার অর্থ শয়তান তার কুমন্ত্রণা দ্বারা মানুষকে তাড়াহুড়া করতে প্ররোচিত করে। কারণ তাড়াহুড়া দৃঢ়তায় ও কাজের পরিণাম চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়। শয়তানের চক্রান্ত ও প্ররোচনাই এজন্য দায়ী।

ভাইয়েরা, এ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে ছোটকাল থেকেই শিশুদের ধৈর্য অবলম্বন ও তাড়াহুড়া বর্জন শিখাতে হবে। ধৈর্যের উপর তাদের লালন-পালন করতে হবে। এর ফলে তাদের যা করা উচিত ও ন্যায়সঙ্গত তা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তারা জানতে পারবে, ধীরে কাজ করার নীতিই দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদ থাকার পথ এবং আল্লাহ তা'আলা ধীরে কাজ করা ভালবাসেন। তিনি বলেন, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ 'কখনই নয়, তোমরা (মানুষ) বরং দ্রুতলভ্যকে (দুনিয়াকে) ভালবাস' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২০)*।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত 'كَلَّا' শব্দ দ্বারা তাড়াহুড়া না করতে সতর্ক করা হয়েছে এবং ধীরতা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ 'তোমার মধ্যে দু'টি গুণ আছে যা আল্লাহ ভালবাসেন, সহিষ্ণুতা ও ধীরতা'।[৫] সুতরাং হে যুবক! ধীরতা এমন গুণ যা আল্লাহ ভালবাসেন, সুতরাং তুমি তা অবলম্বন করো। তুমি নিরাপত্তা লাভকারী ও দৃঢ় পথের পথিক হ'তে পারবে।

অধঃপতনের আরেকটি কারণ ফিৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়া। ফিৎনার জাঁকজমকভাব ও জৌলুস দেখে বহু যুবক তাতে অবাক হয়ে যায়। অনেক সময় বেহুদা কাজে মশগূল তরুণ-যুবকরা তাদের ফিৎনার পথে টেনে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় ফিৎনাবাজদের বিলাসী জীবন যাপন করতে দেখেও তারা ফিৎনার প্রতি প্রলুব্ধ হয়। অথচ ফিৎনা থেকে দূরে থাকা এবং তার ধারে-কাছেও না যাওয়াই ছিল ফরয।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ 'অচিরেই বহু ফিৎনা দেখা দেবে। সেই ফিৎনাকালে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি দ্রুত বেগে ধাবিত ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। যে ব্যক্তি ফিৎনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিৎনা তাকে গ্রাস করে ছাড়বে। আর যে ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে সে যেন সেই আশ্রয় গ্রহণ করে'।[৬]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, تَكُونُ فِتْنَةٌ، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ 'এক সময় এমন ফিৎনা দেখা দেবে যখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। আবার দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য কোন স্থান কিংবা আশ্রয় পাবে সে যেন সেই আশ্রয় গ্রহণ করে'।[৭]

অর্থাৎ হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, মানুষ যতই ফিৎনার নিকটবর্তী হবে ততই তারা খারাপের সাথে জড়িয়ে পড়বে। এজন্যই যুবসমাজের অধঃপতন এবং ফিৎনায় জড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ ফিৎনা ও ফিৎনাবাজদের পাশে তাদের অবস্থান।

আবূদাঊদ (রহঃ) ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ، مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ 'যে দাজ্জালের

হানা অধর্ম' 'দেহ আমার সিদ্ধান্তও আমার' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার বেসাতি করে সমাজে এরাই ফিৎনা-ফাসাদ ছড়ান, কিন্তু এরা তা স্বীকার করতে চান না।- অনুবাদক।

৪. *তিরমিযী, হা/২০১২, সনদ দুর্বল।*

৫. *মুসলিম হা/১৭।*

৬. *বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/৭১৩৯।*

৭. *মুসলিম হা/৭১৪১।*

আবির্ভাবের কথা শুনবে সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। কেননা আল্লাহ্র কসম! যে কোন লোক যখন তার কাছে যাবে, তখন সেই তাকে মুমিন মনে করবে এবং তার মধ্যে তখন নানা সন্দেহ জাগবে বিধায় সে দাজ্জালের পিছু নেবে'।[৮]

সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি কারো সম্পর্কে শুনতে পাবে যে, সে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্র বিপরীতে আইন-কানূন খাড়া করছে এবং মানুষকে আলেম-ওলামা ও (কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি অনুযায়ী) শাসন ক্ষমতায় আসীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে, তখন সে যেন অবশ্যই তার থেকে দূরে থাকে। যদিও তার মনে হয় যে, লোকটার কথার পিছনে দলীল-প্রমাণ আছে এবং সে হক পথের উপর আছে তথাপি এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কী তা সে জানে না। ফলে সে না বুঝে কখনো কখনো তার কাছে এসে তার কথা শোনার ফলে ফেৎনায় পতিত হয়। অথচ সে মনে করে যে, সে ভালই করছে এবং তার মনে প্রকৃত ইসলাম নিয়ে সন্দেহ জাগতে থাকে। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দা, ফেৎনা থেকে কঠিনভাবে দূরে থাকবে।

খোদ পাপ কাজ অধঃপতনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আবার পাপ কাজের পিছনে পেরেশানি ও কুচিন্তার মতো যেসব কারণ কাজ করে সেগুলোও অধঃপতনের কারণ। পাপ, পেরেশানি ও কুচিন্তা সর্বতোভাবে মানুষকে বিপদগামী করে। ভাইয়েরা আমার! তার কারণ একটা পাপ আরেকটা পাপ টেনে আনে। পাপ একে অপরের সঙ্গে গলা ধরে জড়িয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, একটা পাপ করলে তা সামনের আরেকটা পাপের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ 'অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিলেন' *(ছফ ৬১/০৫)*।

পাপের এ দরজা ব্যাপক প্রশস্ত। এজন্যই জনৈক পূর্বসূরি বলেছেন, 'ভালোর প্রতিদান ভালো এবং মন্দের প্রতিফল মন্দ'। ভাইয়েরা আমার! পাপ ও গর্হিত কাজের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির জীবন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। তা থেকে কখনই তার মুক্তি মেলে না। কখনও তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠলেও তার অন্তর থাকে মহা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى،

'আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে? অথচ আমি তো দুনিয়াতে ছিলাম চক্ষুষ্মান। আল্লাহ বলবেন, এটাই বিধান। তোমার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আর সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হ'ল' *(ত্ব-হা ২০/১২৪-১২৬)*।

তাদের কারো কারো জীবনে তো সঙ্কট খুবই গভীর হয়ে দাঁড়ায় এবং তার জন্য বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। আল্লাহ আশ্রয় দিন এমন জঘন্য কাজ থেকে। আত্মহত্যা তো অনেক বড় কবীরা গুনাহ। অনেকের মন আবার দুশ্চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে সে তার প্রতিকারার্থে অন্য একটা পাপ করে বসে। তাতে তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি আরো বেড়ে যায়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক জাতির সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানীজন এ কথায় একমত যে, পাপ-পঙ্কিলতা ও ফিৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষের মনে দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, ভয়-ভীতি, দুঃখ-বেদনা, মানসিক সংকীর্ণতা, হার্টের রোগ ইত্যাদির জন্ম হয়। এমনকি ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা যখন কোন একটা ফিৎনা-ফাসাদে পতিত হয় এবং তাদের মন তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের মনের মধ্যে বিদ্যমান সংকীর্ণতা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করতে নতুন কোন ফিৎনা-ফাসাদ আমদানিতে সচেষ্ট হয়। যেমন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের জনৈক ব্যক্তি এক পংক্তিতে বলেছেন,

وَكَأْسٍ شَرِبتُ عَلى لَذَّةٍ + وأخرى تَداوَيتُ مِنها بِها

এক পিয়ালা পান করি আমি মজা পেতে,
আর এক পিয়ালা পান করি তার প্রতিকারে।

আমার ভাইয়েরা! এ রোগের ওষুধ হ'ল : পাপী ব্যক্তি দ্রুতই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসবে এবং খালেছ মনে তওবা করবে। তওবা ছাড়া আর কোন উপায়ে তা থেকে আরাম ও প্রশান্তি মিলবে না। যে অধঃপতনের নানা কারণ থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক তার কর্তব্য হবে আল্লাহ্র কাছে সত্য ও খাঁটি মনে তওবা করা।

ভাইয়েরা আমার!

অধঃপতনের কারণ অনেক। আমাদের বর্ণিত কারণ ছাড়াও এক্ষেত্রে আরও অনেক কারণ আছে।[৯]

৮. *আবুদাঊদ হা/৪৩১৯, সনদ ছহীহ।*

৯. *সম্মানিত লেখক যুবসমাজের অধঃপতনের যেসব কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করেছেন সেগুলো যদি জেনে-বুঝে আমরা এবং আমাদের যুবসমাজ অধঃপতনের কারণ থেকে মুক্ত হ'তে সচেষ্ট হই তবে আমাদের সমাজ ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও নিরাপদ হবে। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থিত ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে চলতে পারব ইনশাআল্লাহ। তাঁর বর্ণিত কারণ ছাড়াও যেমনটা তিনি বলেছেন আরো অনেক কারণ রয়েছে। আমরা তেমন কিছু কারণ এখানে তুলে ধরছি। সেসব কারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ অন্যতম। বিশ্ব জুড়ে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়জয়কার। এ সভ্যতার কিছু ভাল দিক থাকলেও আমরা তার ভালটুকু গ্রহণের স্থলে মন্দ দিকই বেশী গ্রহণ করছি। নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, লিভ টুগেদার, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, ধূমপান, মাতা-পিতা ও বয়স্কদের দায়িত্ব বহন না করা, পারিবারিক ভাঙনের মাঝে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শিশুর বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ।*
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশও আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোবলে আক্রান্ত। ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সাও যুবসমাজের

তবে আমার পক্ষে সময় যতটুকু সুযোগ দিয়েছে ততটুকু আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমাদের সকলেরই কর্তব্য হবে অধঃপতনের বিপদ উপলব্ধি করা। আমরা যেন বিচ্যুতির কারণসমূহের প্রতিকারে খুব সচেষ্ট থাকি। আমাদের মধ্যে যারা অধঃপতন ও বিচ্যুতির শিকার হয়েছে তাদের সোজা পথে ফিরিয়ে আনতে যেন আমরা তৎপর হই। কারো সোজা পথে ফিরে আসা নিয়ে আমরা যেন হতাশ না হই। কেননা মানুষের অন্তর তো করুণাময় আল্লাহ্র দুই আঙুলের মাঝে। তিনি যেভাবে চান পরিবর্তন করেন। ভাইয়েরা, আমাদের কর্তব্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা। আমাদের রবের নিকটেই তো রয়েছে চূড়ান্ত কৌশল। তার হাতেই তো রয়েছে সকল কাজ।

আমার ভাইয়েরা!

আমরা আল্লাহ্র পথের দাঈ হই আর খতীব হই, যা-ই হই না কেন, আমাদের নিজেদের বেলাতেও অধঃপতনের কারণাদি থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। আমরা যেন নিজেদের নিয়ে ধোঁকায় না পড়ি। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। অবশ্যই নিজেদের কথাবার্তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের দাওয়াতী বিষয় ও কাজ পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পাল্লায় নিজেদের কার্যাবলী মাপতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক এই মাপামাপি না আমাদের বুঝ অনুযায়ী হবে, না আমাদের মতো লোকেদের বুঝ অনুযায়ী হবে। বরং তা হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর বুঝ অনুযায়ী। তাদের বুঝ অনুযায়ী যারা এক আলোকোজ্জ্বল ধারায় ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের বার্তা আজ আমাদের নিকট তুলে ধরেছেন, তারা হ'লেন সেই সকল আলেম যারা সুন্নাহ্র জ্ঞানে সুপরিচিত, জ্ঞান-গরিমা ও জানা-বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ।

হে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীগণ! আমাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের বিচার করা এবং আমাদের মাঝে অধঃপতন ও বিচ্যুতির যেসব কারণ রয়েছে তার চিকিৎসা ও প্রতিকারে এগিয়ে আসা। আমাদের যুবসমাজ যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং অধঃপতনজাত কোন কাজের মজায় যেন তারা বিভোর হয়ে না থাকে। কেননা অধঃপতনের শুরুতে মজা মিললেও তার শেষ পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং ভাইয়েরা আমার, আসুন, আমরা আল্লাহকে ভয় করি। তার সুন্দর ও মহতী নাম ধরে তার নিকট এই আবেদন-নিবেদন করি, তিনি যেন পথহারা মুসলিমদের পথের দিশা দান করেন।

হে আল্লাহ! তুমি পথহারা মুসলিমদের পথের দিশা দাও, আমাদেরকে সঠিক পথের অগ্রপথিক করো এবং সঠিক পথপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করো।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ দান করো এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদের সঠিক পথ দান করো। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু, তুমি এই উম্মতের জন্য সঠিক কাজ, সঠিক পথ ও তাক্বওয়া লাভ সহজ করে দাও; হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক।

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে এই মিনতি করছি যে, তুমি সকল মুসলিমের অন্তরকে হেদায়াত ও দ্বীন ইসলামের উপর একাট্টা করে দাও; হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ! উম্মাহ্র মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের যত কারণ আছে তা তুমি দূর করে দাও। হে আল্লাহ! উম্মাহ্র মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের যত কারণ আছে তা তুমি দূর করে দাও। হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুন্নাহ্র অনুসারী হিসাবে বাঁচিয়ে রাখো, সুন্নাহ্র অনুসারী হিসাবে মরণ দিও এবং সুন্নাহ্র উপরে হাশরে উঠায়ো! হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের তুমি সামর্থ্য দাও তোমার নবী করীম (ছাঃ)-কে ভালবাসার; তোমার নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ভালবাসার। আর আমাদেরকে তুমি তাঁর সুন্নাতের উপর অটল ও স্থির রেখো সেদিন পর্যন্ত, যেদিন আমরা তোমার সাক্ষাতে মিলিত হব। হে রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আড়াল করে রাখ ধরণীর বুকে, আড়াল করে রেখো ধরণীর তলে এবং আড়াল করে রেখো আমলনামা উত্থাপনের দিনে। আমলনামা উত্থাপনের দিনে আমাদের পাপের কারণে তুমি আমাদেরকে তোমার সামনে অপদস্থ করো না। আ-মীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর।

অধঃপতনের পিছনে দায়ী। ক্ষমতার অলিন্দে যাদের বসবাস তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ কতটা ভোগ করছে এবং দেশে-বিদেশে কিভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ছে তা দেখে যুবসমাজের মনে ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সা জাগা অসম্ভব নয়। সুনীতির মাধ্যমে সবসময় এসব কিছু উপার্জন সম্ভব নয় বলে দুর্নীতিকে এখন সকলেই প্রশ্রয় দিতে চায়। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সবাই দহরম-মহরম গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যাতে পরবর্তীতে কোন জটিলতায় পড়তে না হয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও যুবকদের অধঃপতনে কম-বেশী ভূমিকা রাখছে। পার্থিব জীবনের সুযোগ-সুবিধা অর্জনই এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরকালের চিত্র আলোচনা এখানে একেবারেই গৌণ। আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার আলোচনা আমাদের উচ্চশিক্ষায় বলতে গেলে একেবারেই নেই। কেউ হয়তো বলবেন, আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে খারাপ কিছু করতে বলে না। কথা সত্য বটে, কিন্তু খারাপ পরিবেশে আত্মরক্ষার কোন উপায়ও তা নির্দেশ করে না। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে এই শিক্ষিত শ্রেণীই যে অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, গণমাধ্যম ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে তা তো অসত্য নয়।

আমাদের পরিবার ও সমাজও যুবসমাজের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। পরিবার থেকে অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের কোন ব্যবস্থা নেই। কারো ছেলেমেয়ের মধ্যে অবক্ষয় দেখা দিলে প্রয়োজন মুহূর্তে তাদের ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। অনেকে গান-বাজনা, খেলাধূলা ও সংস্কৃতিচর্চার নামে বিকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংশোধন করতে চায়। এতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ থেকে দলবদ্ধভাবে যুবসমাজকে অবক্ষয়মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের মাঝে কমই পরিলক্ষিত হয়।- অনুবাদক!

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

নীতিমালা

ক-গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

*** আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফালাক্ব ও নাস।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ-গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৪/৫৯, বনূ ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫ ও হজ্জ ২২/২৩-২৪ আয়াত *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করতে হবে)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান স্বদেশ (বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ ৪৭-৬২ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান ৭৬-৮৫ পৃ.), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ও গণিত ৮৬-৯২ পৃ.), রহস্য (৯৩ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

প্রবন্ধ রচনা : প্রবন্ধের বিষয় : সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ।

রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালক/সহ-পরিচালকগণ' অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা কম্পিউটার কম্পোজকৃত এবং শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হার্ড কপি ও সফট কপি কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সফট কপি পৌঁছানোর মাধ্যম : Email : sonamoni23bd@gmail.com

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ১৪ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ২১শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২৮শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

মুসলিম শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ*

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মুমিনের সার্বিক জীবন গড়ে উঠবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি মানব শিশুর জন্মই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টি কৌশলের বহিঃপ্রকাশ। শিশুর জন্ম পিতামাতার জন্য যেমনভাবে আনন্দদায়ক, তেমনি আল্লাহ্র দেয়া শ্রেষ্ঠ নে'মত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে হোক বা মেয়ে হোক পিতা-মাতার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল আল্লাহ্র প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রশংসা জ্ঞাপন করা। অতঃপর শরী'আত অনুসরণ করে ধাপে ধাপে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা। আলোচ্য নিবন্ধে মুসলিম শিশুর জন্মপরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর করণীয়

তাহনীক ও দো'আ করা : নবজাত শিশুর জন্য প্রথম করণীয় সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নবজাত শিশুদের নিয়ে আসা হ'ত, তিনি তাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দো'আ করতেন এবং তাহনীক করতেন'।[১]

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর খেজুর, মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন খাদ্য বস্তু চিবেয়ে শিশুর মুখে দেওয়াকে তাহনীক বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে নরম করে মুখের লালা মিশ্রিত চিবানো খেজুর দিয়ে তাহনীক করতেন। যেমন আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, وُلِدَ لِى غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، 'আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম এবং খেজুর দিয়ে তার তাহনীক করলেন'।[২]

সুতরাং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুত্তাক্বী আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তির নিকট শিশুকে নিয়ে গিয়ে তাহনীক ও দো'আ করে নিতে হবে। তাহনীক করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مَا رَزَقْتَهُمْ، (আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম) 'হে আল্লাহ তাকে সর্ব বিষয়ে বরকত দান কর এবং যে রিযিক দান করেছ তাতেও বরকত দান কর'।[৩]

শিশুর নাম রাখা : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে তার অর্থপূর্ণ ভাল নাম রাখা। বিভিন্ন হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সন্তান জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন কিংবা সাত দিনের মধ্যে সুবিধা মত যেকোন দিন নাম রাখতে হয়। নাম রাখার জন্য ৭ম দিনে আক্বীক্বা করা পর্যন্ত বিলম্বিত করার প্রয়োজন নেই। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, গত রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি আমার পিতার নামানুসারে ইবরাহীম।[৪]

শিশু জন্মগ্রহণের পর বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

১. আযান ও ইক্বামত : শিশু জন্মগ্রহণের পর প্রথম করণীয় হিসাবে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিতে হবে অথবা তার কানে আযান দিতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলির একটিও ছহীহ নয়। বরং এর কোনটি যঈফ আবার কোনটি মওযূ বা জাল।[৫] কেবলমাত্র আযান দেওয়া সংক্রান্ত আবূ রাফে' (রাঃ) বর্ণিত অতি প্রসিদ্ধ হাদীছটি সম্পর্কে শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে আবূ রাফে' (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছটি হাসান বললেও এখন আমার নিকট বর্ণনাটি যঈফ হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে।[৬]

২. জন্মকালীন প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ'আত : শিশু জন্মগ্রহণের সময় আমাদের দেশে অনেক প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এর কোনটি শিরক আবার কোনটি বিদ'আত। যেমন-

(১) প্রসব বেদনায় কষ্ট হ'লে অথবা প্রসবে বিলম্ব হ'লে গর্ভবতীর দেহে তাবীয-কবয বাঁধা। যা সুস্পষ্ট শিরক। বরং এ সময়ে করণীয় হচ্ছে, অভিজ্ঞ ডাক্তার বা ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া।

(২) প্রসূতির ঘরে ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাড়ু, লোহার বস্তু প্রভৃতি টাঙ্গানো।

(৩) শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জিন-ভূতের আছর বা মানুষের বদ নযর লাগার ভয়ে হাত, পা বা গলায় তাবীয-কবয বেঁধে দেওয়া।

(৪) শিশুকে বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য কপালের পাশে কালো ফোঁটা বা টিপ দেওয়া।

(৫) শিশু জন্মের সপ্তম দিনে 'সাতলা' অনুষ্ঠান করা।

(৬) শিশু ভূমিষ্ঠের ৪০ দিনে প্রসূতির 'পবিত্রতা' অর্জনের জন্য বাড়ী-ঘর ধোয়া-লেপার বিশেষ আয়োজন করা।

যেকোন অবস্থায় সকল প্রকার তাবীয ব্যবহার করা শিরক। সেটা কুরআনের সূরা, আয়াত বা বানোয়াট নকশা দিয়ে লেখা

---

* মোহনপুর, রাজশাহী।

১. মুসলিম হা/২৮৬; মিশকাত হা/৪১৫০।
২. বুখারী হা/৫৪৬৭; মুসলিম হা/২১৪৫।
৩. বুখারী হা/৪৯৬০; মিশকাত হা/৩৯৭২।
৪. মুসলিম হা/২৩১৪; আবূ দাঊদ হা/৩১২৬।
৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১, হা/৬১২১।
৬. সিলসিলা যইফাহ হা/৬১২১।

হোক অথবা গাছ-গাছড়া জাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে হোক না কেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাল সে শিরক করল'।[৭]

করণীয় : বদ নযর থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন- أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ- *'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বা-নিন ওয়া হাম্মা-তিন ওয়া মিন কুল্লি 'আয়নিন লাম্মাহ'*। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও ক্ষতিকর চক্ষু থেকে পরিত্রাণ চাই'।[৮] সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য উক্ত দো'আ ও তৎসঙ্গে সূরা ফালাক্ব ও নাস ৩ বার করে পাঠ করতঃ সকাল-সন্ধ্যায় ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। যা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৯]

আক্বীক্বা করা :

শিশু জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের পক্ষ থেকে যবহ করা পশুকে আক্বীক্বা বলা হয়। আক্বীক্বা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ- 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়'।[১০]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে'- একথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তাহ'লে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না'। কেউ বলেছেন, আক্বীক্বা যে অবশ্য করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয়, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট সে দায়বদ্ধ থাকে'।[১১]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এর অর্থ এটা হ'তে পারে যে, আক্বীক্বা বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না হয়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না'। সন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত।[১২] অতএব এজন্য শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوْا عَنْهُ الْأَذَى- অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও (অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও)।[১৩]

সপ্তম দিনে আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত।[১৪] রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীক্বা সপ্তম দিনে করেছিলেন।[১৫] বিশেষ ওযর বশতঃ সপ্তম দিনের পূর্বে বা পরে আক্বীক্বা দেওয়া যাবে।[১৬]

ইমাম শাফেঈ বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না। যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়, এমনকি সন্তান বালেগ হয়ে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে তার অভিভাবকের আক্বীক্বার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবে।[১৭] অতএব শৈশবে কারো আক্বীক্বা না হয়ে থাকলে, তিনি বড় হয়ে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবেন।[১৮] খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমি জানতাম, আমার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতাম।[১৯] হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন যে, যদি তোমার আক্বীক্বা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হও।[২০]

যদি কেউ আক্বীক্বা ছাড়াই মারা যায়, তবে তার আক্বীক্বার প্রয়োজন নেই।[২১] আর সামর্থ্য না থাকায় পিতা আক্বীক্বা দিতে ব্যর্থ হ'লে তার উপর কোন দোষ বর্তাবে না।[২২]

আক্বীক্বার পশু হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে তার বদলে আরেকটি পশু আক্বীক্বা দিবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে'।[২৩] সেটি যবেহ করার পর যদি আগেরটি পাওয়া যায়, তবে সেটি যবেহ করা যরূরী নয়। এটি কুরবানীর পশুর বিপরীত। কেননা কুরবানীর পশু মারা গেলে বা হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তার পরিবর্তে অন্য পশু যবেহ করা আবশ্যিক নয়।[২৪]

আক্বীকার পশু : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا- 'নর

---

৭. *আহমাদ হা/১৭৪৫৮।*
৮. *বুখারী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/১৫৩৫।*
৯. *মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০, 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়।*
১০. *আবূ দাঊদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৬।*
১১. *নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।*
১২. *মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ হা/৪১৫৩-এর ব্যাখ্যা।*
১৩. *বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯ 'যবহ ও শিকার' অধ্যায়, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *আবূদাঊদ হা/২৮৩৮।*
১৫. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৩১১, সনদ হাসান।*
১৬. *নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৯।*
১৭. *নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ.।*
১৮. *ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৩, ২৫/২২২ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২৬৫-৬৬ পৃ.।*
১৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮।*
২০. *ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা।*
২১. *নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।*
২২. *ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৪, ২৫/২২২ পৃ.।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩; আত-তাহরীক, মে ২০০৯, ১২/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৬/২৮৬।*
২৪. *মির'আত ৫/১১৯।*

www.at-tahreek.com

হৌক বা মাদী হৌক, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা দিতে হয়'।[২৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে এক একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেছিলেন।[২৬] অত্র হাদীছ মতে, পুত্র সন্তানের জন্য একটি দুম্বা বা ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করাও জায়েয প্রমাণিত।[২৭]

একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রণীত ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী অনূদিত 'বেহেশতী জেওর' নামক বইতে আক্বীক্বা-র মাসআলা নং ২ এ লেখা হয়েছে 'কিংবা কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে'।[২৮]

উপরোক্ত মাসআলার ভিত্তিতেই এদেশের কোন কোন মহলে ৭ ভাগা গরু কুরবানীর একই পশুতে আক্বীক্বার জন্যও ভাগা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। অথচ এই আমলটি সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাফ। প্রথমতঃ গরু দ্বারা আক্বীক্বা করা সম্পর্কে যে হাদীছ চালু রয়েছে তা মাওযূ বা জাল।[২৯] দ্বিতীয়তঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। এটা এদেশে প্রচলিত ভিত্তিহীন নতুন প্রথা। যা হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য।[৩০]

আক্বীক্বার পশু যবহ করার দো'আ ও নিয়ম : প্রথমে আক্বীক্বার পশুকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে শোয়াতে হবে। মনে মনে আক্বীক্বার নিয়ত বা সংকল্প করতে হবে। গৎ বাঁধা মৌখিক নিয়ত পাঠ করবে না। অতঃপর বলবে, اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَقِيقَةُ فُلاَنٍ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، *'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আক্বীক্বাতা ফুলান, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'*। এ সময় ফুলান এর স্থলে শিশুর নাম বলা যাবে। মনে মনে আক্বীক্বার নিয়ত করে কেবল 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করলেও যথেষ্ট হবে।[৩১]

সপ্তম দিবসে অন্যান্য করণীয় : শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা ছাড়াও নবজাতকের মাথা মুণ্ডনের পর চুলের ওযন পরিমাণ রূপা বা রূপার মূল্য পরিমাণ অর্থ ছাদাক্বা করা উত্তম।[৩২]

ইসলামী নামের গুরুত্ব : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য, বিশেষভাবে ঈমানদার মুমিনের ক্ষেত্রে নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। আর তা এজন্য যে, সকল শুভ কাজের সূচনা তাকে তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র 'নাম' উচ্চারণ করে তথা 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়।

মহান আল্লাহ্র কাছে নামের গুরুত্ব এত বেশী যে, সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তিনি সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিতে সক্ষম হওয়ায় আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

মহান আল্লাহ তাঁর নিজ নামকে এতই ভালবাসেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সে নামে তাঁকে ডাকো' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। ক্বিয়ামতের ময়দানে সকল বনু আদমকে আল্লাহ বিচারের জন্য সমবেত করে ডাকবেন পিতা ও পুত্রের নাম ধরে।[৩৩]

জগত সংসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে পারস্পরিক পার্থক্য সূচিত হয় নাম দিয়ে। সামাজিক লেন-দেন, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে একমাত্র নাম দিয়ে। এক কথায় নাম বিহীন মানব সমাজ অচল ও অথর্ব হ'তে বাধ্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি বান্দার জন্য উভয় জগতে 'নাম' এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কোন কোন অসচেতন পিতা-মাতা কলিজার টুকরা সন্তানের যদি নাম রাখেন- পচা মিয়া, দুখু মিয়া, ঝড়ু, ধনু, বিষু, মুঙ্গলা, ফেলানী, পুতুল ইত্যাদি তখন শুধু তা অর্থহীন খারাপ নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সারা জীবন যন্ত্রণাদায়ক অমোচনীয় এক বোঝা বহন করতে হয়, সে দিনের সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে।

সুন্দর অর্থপূর্ণ আরবী ভাষার নাম ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাম দ্বারা মানুষের ধর্ম, বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে। নাম দ্বারাই পৃথক জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায়। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ কোন জাতিই মুসলমানদের নামে সন্তানের নাম রাখে না। যেমন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান কখনই তার সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বা ফাতেমা, আয়েশা, রুকাইয়া প্রভৃতি ইসলামী নাম রাখতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, মুসলমানরা হিন্দুয়ানী বা খৃষ্টানী নাম রাখতে একটুও লজ্জা পায় না। মুসলমানদের মধ্যে দুলাল, পলাশ, রাহুল, নির্মলা, জ্যোস্না, মৌসুমী, ঝরণা, মিল্টন, রিপন, বুলেট, শেফালী, বাবলু, নদী, সাগর প্রভৃতি অর্থহীন ও বিজাতীয় নাম রাখার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষায় বলা যায়-

সাত হাযার মাইল দূর হ'তে এসে রয়েছে তোদের দেশে
কিন্তু পরে না তোদের লেবাস ফিরিছে আপন বেশে।
নাম রাখে না তোদের নামে কভু জন্মিলে সন্তান
এ নহে শুধু মোর মসি গঞ্জনা নিয়ে দেখ সন্ধান।
তবে তুমি ওগো মুসলিম হইয়া কেন আপনহারা
পরগাছা সাজি বিজাতীয় সাজে রয়েছ পাগলপারা।[৩৪]

---

২৫. আবুদাঊদ হা/২৮৩৪, ২৮৪২; তিরমিযী হা/১৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৩; মিশকাত হা/৪১৫২, ৪১৫৬; ইরওয়া হা/১১৬৬।
২৬. বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭৬; হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৫৫।
২৭. মাসায়েলে কুরবানী, পৃ. ৪৯।
২৮. বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী), ৩০০ পৃ.।
২৯. হা.ফা.বা. প্রকাশিত বই মাসায়েলে কুরবানী, পৃ. ৪৯।
৩০. মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫৫ প্রশ্নোত্তর পর্ব।
৩১. মাসায়েলে কুরবানী পৃ. ৫০।
৩২. মাসায়েলে কুরবানী পৃ. ৪৭।
৩৩. বুখারী হা/৬১৭৮; মুসলিম হা/১৭৩৫।
৩৪. মুক্তির সন্ধান, মুহাম্মাদ দুররুল হুদা আইউবী।

শিশুর নাম রাখার সময় অবশ্যই বিধর্মীদের অনুকরণ করা যাবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হবে।[৩৫] অত্র হাদীছ দ্বারা অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল বিষয় পরিত্যাগ করা অপরিহার্য প্রমাণিত হয়। আর নামকরণ বিষয়টি এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তার পিতার নাম সহ ডাকা হবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রথম ও শেষ দলের সকলকে একত্রিত করবেন। তারপর সেদিন প্রত্যেক খেয়ানতকারী ব্যক্তির জন্য একটি করে পতাকা উত্তোলন করবেন। তারপর বলা হবে এটা অমুকের পুত্র-অমুকের কৃত খেয়ানত।[৩৬]

অর্থহীন নাম পরিহার করতে হবে : প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সামনে কোন নবাগত লোক আসলে, তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। ভাল নাম হ'লে সন্তোষ প্রকাশ করতেন। অপসন্দ হ'লে তা পরিবর্তন করে দিতেন। তিনি অশুভ, ঘৃণাদায়ক, অর্থহীন, অতি বিশেষণমূলক ও আত্মঅহংকার প্রকাশ পায় এমন বহু নামের পরিবর্তন করেছেন। যেমন তিনি আসীয়া (বিদ্রোহীনি, পাপিয়সী) নামটি পরিবর্তন করে বললেন, তুমি জামীলা (সুন্দরী)।[৩৭] বাররাহ (অত্যন্ত ধার্মিকা) নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখেন যয়নাব (সুগন্ধময় ফুল)।[৩৮] হাযন (শক্ত মাটি) নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন সাহল (নরম মাটি)।[৩৯] এভাবে নাম পরিবর্তনের কথা বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তাই অর্থহীন নাম আরবী ভাষার হ'লেও তা পরিবর্তন করতে হবে। খাঁটি বাঙ্গালী সাজতে গিয়ে অনেকে পিতৃপ্রদত্ত আরবী নামের সাথে বাংলা নাম মিশ্রণ করে নামকরণ করে থাকেন। যেমন অমিত হাসান, ফটিক রহমান, অনিক মাহমূদ, শুভ রহমান ইত্যাদি। ইদানীং কেউ কেউ পিতৃপ্রদত্ত আরবী নাম বিকৃত আকারে প্রকাশ করছেন। যেমন মালেক মেহমুদ, শফিক রেহমান, রেহমান সোবহান ইত্যাদি। এভাবে রহমানকে রেহমান, মাহমূদকে মেহমুদ উচ্চারণ করা গুরুতর অপরাধ।

প্রচলিত আরবী ভুল নাম : বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রচলিত সব আরবী নামই কিন্তু নির্ভুল নয়। যেমন আল্লাহ ব্যতীত নবী ও রাসূল, পীর, ইমাম প্রভৃতি মাখলূকের নামের পূর্বে আরবী 'গোলাম' এবং ফার্সী শব্দ 'বখ্শ' (দান) যোগ করে নামকরণ করা। যা শিরক। যেমন আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস), গোলামুন্নবী (নবীর দাস), গোলাম রাসূল (রাসূলের দাস), গোলাম মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদের দাস), গোলাম মুছতফা (মুছতফার দাস), আলী বখশ (আলীর দাস), মাদার-বখশ (মাদার বা পীরের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (মহিউদ্দীনের দাস), গোলাম হোসায়েন (হোসায়েনের দাস) প্রভৃতি।

যেসব নাম রাখা সর্বোত্তম : ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহীয়ান-গরিয়ান আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের নামগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।[৪০] তদ্রূপ 'আসমাউল হুসনা' (আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ)-এর পূর্বে 'আব্দ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা হ'লে তা উক্ত হাদীছের মর্মানুযায়ী আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও পসন্দনীয় হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ তাতে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশ পায়।

নাম রাখার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নবীদের নামে নাম রাখ, আল্লাহ্র কাছে প্রিয় নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সবথেকে যথার্থ নাম হ'ল হারেছ (পরিশ্রমী), হাম্মাম (আগ্রহশীল)। সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম হ'ল হারব (যুদ্ধ) ও মুররা (তিক্ত)।[৪১]

নাম রাখার ক্ষেত্রে আরো কিছু লক্ষণীয় বিষয়-

(ক) আল্লাহ্র গুণবাচক নামের সাথে 'আব্দ' (দাস) শব্দ যুক্ত করে নাম রাখা উত্তম। যথা আব্দুল মালেক (মহাপ্রভুর দাস), আব্দুল খালেক (সৃষ্টিকর্তার দাস), আব্দুল গাফফার (মহা ক্ষমাশীলের দাস) ইত্যাদি।

(খ) ইসলামী ভাল নামের ক্রমানুসারে নবী-রাসূলদের নামের পরেই রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য ধন্য ইমলামের অগ্রগামী দল মহান ছাহাবীদের নামের মালা। যে মালার প্রতিটি পুষ্প ছিল ফুটন্ত গোলাপ। যার সুবাস ও সুঘ্রাণ মুমিনের মনকে করে তোলে আমোদিত। ছাহাবীগণের নামে নাম রাখা নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুপম ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং শিশুর নামকরণের সময় মহান ছাহাবীগণের নাম হ'তে সন্তানের নাম নির্বাচন করা উত্তম। মোদ্দাকতঅ, শিশুর নামকরণের সময় সমাজে প্রচলিত নাম সমূহের 'তাক্বলীদ' বা অন্ধ অনুকরণ না করে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থপূর্ণ ইসলামী নাম জেনে নিয়ে সন্তানের নাম রাখা।

পরিশেষে বলতে চাই, শিশুর প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা প্রতিটি পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব ও ছওয়াবের কাজ। তেমনি শিশুর পরিচর্যার পশাপাশি তার সুন্দর নাম রাখা, আক্বীক্বা করা, মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওযনে ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি কাজগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করা কর্তব্য। অতঃপর শিশুকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য কুরআন-হাদীছের নির্দেশ মেনে চলা যরূরী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!!

---

৩৫. বঙ্গানুবাদ বুলুগুল মারাম, ২য় খণ্ড, ৪২০ পৃ. হা/১৪৭২।
৩৬. বুখারী হা/৬১৭৮; মুসলিম হা/১৭৩৫।
৩৭. মুসলিম হা/২১৩৯।
৩৮. বুখারী হা/৬১৯২।
৩৯. বুখারী হা/৬১৯৩।
৪০. মুসলিম হা/৪৭৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৫৬।
৪১. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৮১৪, ৮৩৭; মুসলিম হা/১২৩৫।

বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ

-ড. মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান*

(১)

১৭৯৯ সালে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের পেছনে দু'টি সামাজিক উপাদান বড় প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্র এ সময় নীতিহীনতায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক বৈষম্যের কারণে দেশে দারিদ্র্য বেড়ে গিয়েছিল। ফলে সমাজে অস্থিরতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সমাজ থেকে মূল্যবোধ হারিয়ে গিয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে সমাজের মুক্তিকামী জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা প্রদর্শন করেছিলেন। মূল্যবোধ উপাদানটি ঐ সময় ফরাসী সমাজে আপোষহীনতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ফলে ১৭৮৯ সালে সূচিত হওয়া বিপ্লব ১৭৯৯ সালে চূড়ান্তরূপ লাভ করেছিল।

একই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এ মূল্যবোধের যথেষ্ট চর্চা ছিল। প্রাচীন ভারতে বহু ধর্মের লোক এক সমাজে পাশাপাশি বসবাস করতো। তাদের মাঝে একে অপরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। পাশাপাশি বসবাস করলেও কারো প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। এর মূল কারণ ছিল উন্নত মূল্যবোধ। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জীবন ছিল খুবই উন্নত। ধার্মিকরা ছিলেন চরম পরমতসহিষ্ণু ও পরধর্মসহিষ্ণু। ফলে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠেছিল অনেক উন্নত। এ সময় বাংলায় মূল্যবোধের অনুশীলন ছিল চোখে পড়ার মতো। সুনীতি, সুশিক্ষা আর সুবিচার ছিল বাংলার শাসন ব্যবস্থার অনন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান। সহনশীলতা, উদারতা, মায়া-মমতা আর মানবতা ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। ফলে পুরো উপমহাদেশ হয়ে উঠেছিল মূল্যবোধের পাঠশালা। কিন্তু বর্তমানের অবস্থাটা খুবই হতাশাজনক। বর্তমানে মূল্যবোধের চর্চা এখানে অনেকটাই উপেক্ষিত। বলা হয়ে থাকে, 'যায় দিন ভাল, আসে দিন খারাপ'।

বাংলার বর্তমান অবস্থাটা এ প্রবাদের প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভালটা যেন সমাজ থেকে দিন দিন উঠে যেতে বসেছে। আগের সমাজের মানুষ ধনের চেয়ে নিজেদের সম্মানটাকে বড় করে দেখতো। মান-সম্মানকে মানুষ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতো। কিন্তু বর্তমান সমাজটা একবারেই পাল্টে গেছে। সমাজের মানুষ বিরামহীন ছুটে চলছে বিত্তের পেছনে। বিরামহীন ছুটতে গিয়ে তারা জলাঞ্জলি দিচ্ছে তাদের সততা ও নৈতিকতা। জড়িয়ে পড়ছে তারা নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আর এটা এখন শুধু দেশের একটি সেক্টরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন দেশের প্রতিটি সেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের প্রভাবশালীদের অনেকে দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে রয়েছেন। 'ভবিষ্যতে অনেককেই কারাগারে যেতে হবে' ভয়ে বাঁচবার জন্য তারা এখন থেকেই অনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই অস্বস্তিকর। রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতিহীনতায় নিমজ্জিত। এ নীতিহীনতাই সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসাবে পরিচিত। দেশে নীতির চর্চা এখন অনেকটা বোকাদের কাজে রূপান্তর লাভ করেছে।

নীতিবান লোককে এখন সমাজে তেমন আর সম্মান করা হয় না। সম্মান এখন টাকা ও অর্থ দ্বারা বিবেচনা করা হয়। অথচ এ দেশেই এককালে নীতিবান হতদরিদ্র ব্যক্তিকেও সম্মানের চোখে দেখা হ'ত। প্রাচীন বাংলায় এসব নীতিবান ব্যক্তিই গুণীজন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এ সমস্ত গুণীজনকে সমাজের সকলেই সম্মানের চোখে দেখতো। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় সেদিন আর অবশিষ্ট নেই। নীতি আর মূল্যবোধ চর্চাকে এখন বিদ্রূপের চোখে দেখা হয়। সমাজ এখন 'টাকা যার, সম্মান তার' নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। নীতিবান গুণীজনেরা সমাজে অনেকটা অপাংক্তেয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। বাংলার সমাজ এখন আর গুণীজনদের কদর করে না। তারা কদর করে সূদখোর টাকাওয়ালা মহাজনদের। এসব টাকাওয়ালা ব্যক্তিবর্গ এখন সমাজের পরিচালক ও নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে তারা এখন প্রচণ্ড প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী। সমাজ এখন এসব প্রভাবশালীকেই সম্মান ও তাযীম করে। নীতিহীন এসব ব্যক্তিকেই জনগণ সংবর্ধনা আর সম্মাননা প্রদান করে থাকে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ নীতিহীন মানুষগুলোর মুখ থেকেই আবার নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়!

মুখের উচ্চারণ আর কাগজের মাঝেই দেশের মূল্যবোধ এখন আটকে রয়েছে। প্রভাবশালীদের অনৈতিক শক্তিতে শিকলবন্দি হয়ে পড়েছে দেশের মূল্যবোধ। বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী প্রজন্ম মনুষ্যত্বকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে। একসময় তারা মানুষরূপী দানবে পরিণত হবে। নিকট ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্ম মূল্যবোধকে রূপকথার কল্পকাহিনী হিসাবে খুঁজে ফিরবে। আধুনিক যুগে বাংলাদেশের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূল্যবোধকে পুঁজি করে। একই বছরের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করা হয়েছিল। এ ঘোষণাপত্রটি ছিল মূল্যবোধে উজ্জীবিত এক অসামান্য মূলনীতি। মূল্যবোধের দিক থেকে এ ঘোষণাপত্রটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য এক দলীল। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান। ছিল রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার আইনী দলীল। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।' মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধে রচিত এ সংবিধান

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আজ বলতে গেলে দেশের সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত। স্বাধীন দেশের মানুষের জন্য এটা একদিকে যেমন দুঃখজনক তেমনি লজ্জাজনকও বটে। কারণ জারীকৃত উক্ত নীতির ভিত্তিতে আজকের বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে না।[১]

মূলতঃ জারীকৃত উক্ত মূল্যবোধের অনুপস্থিতিটাই হ'ল আমাদের সামাজিক অবক্ষয়। সমাজে যখন নৈতিক স্খলন ঘটে, যখন চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটে তখনই তাকে সামাজিক অবক্ষয় বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ আজ নানামূখী অবক্ষয়ে জর্জরিত। বাংলাদেশের সমাজে মাদক এবং ইয়াবার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। গাঁজা ফেনসিডিলের ব্যবসাও রমরমা। মাদকতার স্রোতে দেশের যুবসমাজ আজ ভেসে যেতে বসেছে। দেশের কোন কোন জনপ্রতিনিধি এ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি দেশের জনপ্রিয় কয়েকজন নায়ক-নায়িকা মদের ব্যবসার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। এছাড়া দেশের নামি দামী অনেকেই এ ব্যবসায় জড়িত বলে মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে। লোকাল এডুকেশন এন্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্টের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লাখ শিশু আছে, যাদেরকে পথশিশু বলা হয়। এদের মধ্যে ১৯ শতাংশ শিশু হিরোইন আসক্ত। ৪০ শতাংশ ধূমপায়ী। ২৮ শতাংশ শিশু ট্যাবলেটে আসক্ত। আর ৮ শতাংশ শিশু আছে যারা ইনজেকশনে আসক্ত। এটা জাতি-রাষ্ট্রের জন্য ভয়ানক এক অশুভ ইঙ্গিত। এটা মানবিক মূল্যবোধের চরমতম অবক্ষয়।

দেশে বন্যার পানির মতো পর্নোগ্রাফির আসক্তি বেড়ে গেছে। তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীরা বর্তমানে পর্নোগ্রাফির ভয়াল নেশায় মত্ত। আর শুধু শিক্ষার্থীদের মাঝেই এ নেশা সীমিত নয়। মধ্যবয়সী নারী-পুরুষও এ মরণ নেশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। 'মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনে'র এক তথ্য মতে, রাজধানী ঢাকার স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ ভাগ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। ফলে পর্নোগ্রাফি আসক্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ফলশ্রুতিতে অপরিণত ও অসংগতিপূর্ণ যৌনাচার সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। আর এসব অবক্ষয়ের সাথে জড়িত অধিকাংশই শিক্ষিত জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত অবক্ষয়সৃষ্ট অস্থিরতার কারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। এ অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করেছে। ফলে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে। তারা ধৈর্য্য, উদারতা ও শিষ্টাচার হারিয়ে ফেলেছে। কর্মে তাদের নান্দনিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সৃজনশীলতা লোপ পেয়েছে। তারা তাদের অধ্যাবসায়, দেশপ্রেম, কল্যাণবোধ ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী নষ্ট করে ফেলেছে। সামগ্রিক জটিলতার কারণে মানবিক মূল্যবোধের জায়গায় স্থান পেয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবক্ষয় এখন জয়-জয়কার অবস্থা।

দেশের ব্যাংক ব্যবসায় দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরি দেশের মূল্যবোধের বড় অবক্ষয়ের নির্দেশক। শেয়ারমার্কেট, ডেসটিনি, যুবক আর হলমার্ক কেলেংকারীর ঘটনা নৈতিক মূল্যবোধ বিচ্যুতির ইঙ্গিত প্রদান করে। দেশে নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও চুরির ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাকাতি, ছিনতাই, গুম ও খুন এখন স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাস, রাহাজানি ও নৈরাজ্য সামাজিক অবক্ষয় বিস্তৃতির এক মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ।

এসব অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, সর্বগ্রাসী অশ্লীলতা এবং মাদকতা। পাশাপাশি রয়েছে ধর্মবিমুখতা, ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মব্যবসা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা। অথচ যুগযুগ ধরে ধর্মই মানুষকে ভদ্র করে গড়ে তুলেছে। ধর্মের সঠিক অনুশীলন ও শিক্ষা মানুষকে রুচিশীল ও সাংস্কৃতিবান করেছে। ধর্ম ধার্মিকদেরকে করেছে ভদ্র ও মার্জিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সময়কালে আরবের প্রায় সকল মানুষ ছিল ইতর, বর্বর আর নিকৃষ্ট। তারা ছিল অভদ্র, নির্দয়, নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী-পাপী। অথচ ধর্মের সঠিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেই তারাই বিশ্বসেরা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। ধর্মের যথাযথ অনুশীলন তাদেরকে তৎকালীন বিশ্বসেরা গুণীজন হিসাবে ভূষিত করেছিল। গুণীজন হিসাবে তারা শুধু পৃথিবীতেই সেরা মানুষ ছিলেন না। বরং পরকালের জন্য নির্বাচিত সেরা মানুষের স্বীকৃতিটাও এ পৃথিবীতে পেয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন, 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়্যেনাহ ৯৮/৮)*।

হাদীছে এসেছে, 'আবুবকর, ওমর, আলী, ওছমান, তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু যায়েদ ও আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এ দশজন ছাহাবী দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেছেন'।[২] এরকম মূল্যবোধেসিক্ত মানুষ আর পৃথিবীতে আসবে না। বিশ্বের সকল ইতিহাস এটাই জানান দেয় যে, পৃথিবীর সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোন না কোন ধর্মকে কেন্দ্র করে। তাই মূল্যবোধে সিক্ত একটি সমাজ গড়তে প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপক শিক্ষা ও তার যথার্থ অনুশীলন। প্রয়োজন ধর্ম লালন ও তার সম্প্রসারণ। ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) তাই বলেছেন, 'যে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রাধান্য থাকে তাকে সভ্য সমাজ বলে'।

১. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ই এপ্রিল, ২০১৬।*

২. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৫।*

(২)

আধুনিক যুগ একটি পরিবর্তনের যুগ। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে সৌরজগতের এ ছোট পৃথিবীটি। আর যেটুকু আছে সেটুকুও ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তারা হয়ে যাচ্ছে বড্ড অচেনা। ইতিমধ্যে দেশীয় বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবকাঠামোগত নানা দিকেরও পরিবর্তন সাধিত হ'তে চলেছে। আর মানব-জীবনের সবচেয়ে বড় দিক হ'ল মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন। ন্যায় ও অন্যায় বিভাজনে মানুষ এখন বড়ই দ্বিধান্বিত। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলাটা এখনবড়ই দুষ্কর। দেশে কোনটা আলো আর কোনটা অন্ধকার সেটার পার্থক্য করাও বড় কষ্টকর। সততার আলো যেন মানুষের চক্ষুকে এখন ঝলসে দিচ্ছে। মানুষ যেন বুনো বাদুরে পরিণত হয়ে গেছে। পরিণত হয়ে পড়েছে তারা পেঁচায়। দিনের আলো যেন মানুষের এখন ভালো লাগে না। রাতের অন্ধকার তাদের বড়ই প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ তারা দিনের চেয়ে রাতকেই বেশী ভালবাসে। অসৎ মানুষেরা রাতটাকে এখন বাদুড়ের মতো আরামদায়ক করে নিয়েছে। আবহমান-কাল থেকে বাংলার সরকারী-বেসরকারী অফিসগুলোতে 'ঘুষ' নামে একটি অনৈতিক প্রথার প্রচলন ছিল। অনেকদিন ধরে এটাকে বাঙ্গালীরা ঘুষ বলেই জানতো। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এ শব্দটির নামও পরিবর্তন হয়ে এটার নাম এখন 'তদবির খরচ' 'বখশিশ' ইত্যাদি ধারণ করেছে। তথাকথিত শিক্ষিতজন কর্তৃক এটি একটি আনঅফিসিয়াল পরিভাষায় রূপান্তর লাভ করেছে। এটা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের মহা এক ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এটা মূল্যবোধের এক চরম অবক্ষয় হিসাবে সকল মহলে পরিচিত।

ছোট বেলায় এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নৈতিকতা অর্জনের কারখানা। আগেকার দিনে প্রাথমিকে শিশুদেরকে নানা নীতিবাক্য শেখানো হ'ত। 'সদা সত্য বলিবে, মিথ্যা বলিবে না। না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দিবে না। না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দেয়াকে চুরি করা বলে। চুরি করা বড়ো দোষ' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিশুরা রপ্ত করতো। কিন্তু বর্তমানে সেই শিক্ষাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব নীতিবাক্যের জায়গায় 'আগডুম বাগডুমে'র আগমন ঘটেছে। ঘোড়াডুমের মতো অর্থহীন শিখন ও পঠন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। কোমলমতি শিশুদেরকে নীতিহীন করেই আমরা বড় করে তুলছি। এটা আমাদের শিক্ষা কারিকুলামের এক জাতীয় সংকট ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূল্যবোধ জলাঞ্জলির বড় উদাহরণ এর চেয়ে আর কী-ই বা হ'তে পারে!

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়। এটা এক সময় উন্নত জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হ'ত। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেখানেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনলেই আঁৎকে উঠেন। এটা মানবিক মূল্যবোধের ভয়ানক অবক্ষয়ই বলতে হবে। কবি আল-মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই 'ডাকাতের গ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মেধার চর্চা হয় না বললেই চলে। এখানে এখন চর্চা হয় নীতিভ্রষ্ঠ রাজনীতির। এখানে ব্যাপকভাবে এখন নিয়োগ বাণিজ্যের চর্চা হয়। মেধার পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তেলবাজি ও দলবাজিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে দলবাজির কাছে মূল্যবোধ পরাজিত হয়। স্কুল ও কলেজগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। স্কুল-কলেজের কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ এখন ওপেন সিক্রেট। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে মেধাকে খুব কমই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। নির্লজ্জ দলবাজি আর অর্থই শিক্ষক হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর এ অবস্থা সারা দেশের স্কুল-কলেজে কম-বেশী চলমান রয়েছে।

এতে করে বাচ্চাদের হাতেখড়ি হচ্ছে অনৈতিক শিক্ষকের কাছে। এর মাধ্যমে শিশুদের পড়ানোর জন্য আমরা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছি। শিক্ষক যখন দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পান, এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে নৈতিকতা আশা করা অর্থহীন। কারণ তাদের সামগ্রিক নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই নৈতিকতা পরিপন্থী। সুতরাং তারা নিজেরাই মূল্যবোধ বিবর্জিত মানুষ। তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতার নামান্তর। এটি তেঁতুল গাছ থেকে আনারস পাবার আশা করার মতো অর্থহীন ব্যাপার। অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া ঐ শিক্ষকের দ্বারা যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাইতো শিক্ষাঙ্গনে বার বার ঘটছে যৌন নিপীড়নের মতো ঘৃণ্য ঘটনা। কিন্তু ভুক্তভোগীরা এ ঘটনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পাচ্ছেন না। স্বাধীন দেশে আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত লজ্জার ও ঘৃণার বিষয়। জাতি হিসাবে আমরা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিচ্ছি না। অধিকন্তু এ সমস্ত শিক্ষকের সাথে সচেতন নাগরিকরাই একাট্টা হয়ে মিশে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির সাথে আপোষকামী হিসাবে তৈরি হয়ে উঠছে। তারা দুর্নীতিকে আর দুর্নীতি মনে করছে না। অন্যায়কেও অন্যায় হিসাবে আর বিবেচনায় নিচ্ছে না। ফলে তাদের বিবেকবোধ অসুস্থ জরাজীর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাদের সুকুমার প্রবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। ফলে তারা রাষ্ট্রের যেখানেই গিয়েছে সেখানেই সৃষ্টি করেছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

প্রাচীন বাংলায় কোন না কোন একজন শিক্ষক ছিলেন শিক্ষার্থীদের অনুকরণীয় আদর্শ। কিন্তু বিগত কয়েক যুগে সে জায়গাটিরও বিলোপ সাধিত হয়েছে। বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের কাছে কোন শিক্ষকই এখন আর অনুকরণীয় মডেল নেই। নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা কিংবা কোন খেলোয়াড় হয়ে গেছে তাদের অনুসরণীয় মডেল। যুবসমাজ থেকে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা সবই প্রায় হারিয়ে গেছে। এ সমস্ত শিক্ষার্থীদের হাতে গির্জা, মসজিদ এবং মন্দিরও

এখন নিরাপদ নয়। তাদের মাধ্যমেই জন্ম হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। আর তাদের মাধ্যমে রাজনীতি হয়ে পড়েছে কলুষিত। রাজনীতি রাজ্য শাসনের সর্বোচ্চ নীতি হ'লেও সেটা এখন ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। নবীন রাজনীতিকরা প্রবীণ রাজনীতিকদের অনৈতিক চতুরতা রপ্ত করে ফেলেছে। ফলে নবীনরা হয়ে উঠেছেন সীমাহীন অনৈতিক ক্ষমতাবান। প্রবীণদের টিক্কা মেরে তারা সামনে এগিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না। কিছু রাজনীতিকদের নোংরা শব্দচয়ন দেশবাসীকে হতবাক করেছে। এসব রাজনীতিবিদ তাদের নীতিবোধকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। জাতির সামনে তাদের মনুষ্যত্ব কলুষিত রূপ ধারণ করেছে। বলতে গেলে দেশের ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি ক্রমান্বয়ে লুটপাটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এটা এখন অবৈধ অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হয়েছে।

দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এখন নৈতিকতার বড়ই সংকট। আমজনতা এটাকে টাকা উপার্জনের পথ বলেই মনে করে থাকেন। অথচ দেশে গণতন্ত্রের যাত্রার সময় নির্বাচনটা ছিল আনন্দের অনুষঙ্গ। মানুষ উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করতো। পসন্দের প্রার্থীর জয়-পরাজয়ের খবর জানতে মানুষ রেডিও-টিভির সামনে সারা রাত বসে থাকতো। এখন আর সেদিন নেই। রাজনীতিবিদগণ এ ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন একদলের মধ্যেই নির্বাচনী প্রচারণা চলতে দেখা যায়। তাদের মধ্যেই চলে ভোট যুদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হ'তে দেখা যায়। নিজ দলের মধ্যে মারামারী, হাঙ্গামা ও হত্যার ঘটনা এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের (ইউপি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘাত ও মৃত্যুই এর বাস্তব প্রমাণ। প্রথম দফা নির্বাচনী সংঘাতে দেশে মৃত্যু হয়েছিল ৫ জনের। আর দ্বিতীয় দফা নির্বাচনী সংঘাতে মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। এসব ঘটনায় ইলেকশন কমিশনকে শুধু বিব্রতবোধ করতেই দেখা যায়। কমিশন কার্যকরী কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। ফলে যাদের মধ্যে ন্যূনতম ভদ্রতা, মনুষ্যত্ব আর মূল্যবোধ আছে তারা রাজনীতিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। বর্তমানে ভোট তাদের কাছে একটি হাস্যকর নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা একটি দেশের জন্য মোটেই কোন ভালো খবর নয়।

দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। দলীয় মনোনয়ন পেতে স্থানীয় নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে কোটি কোটি টাকা ঘুষ প্রদান করে থাকেন। ইউনিয়ন, থানা ও যেলা কমিটির মনোনয়ন পেতেও কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে দিতে হয় লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টাকা। মিডিয়ার মাধ্যমে এসব খবর এখন অজপাড়াগায়ের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে।

বাঙালি সমাজের প্রতিটি পরিবার এক সময় ছিল একটি বিদ্যালয় সমতুল্য। এই পরিবারই ছিল নৈতিকতা অর্জনের সূতিকাগার। এখন সেটা আর সে অবস্থায় নেই। এখন সেটারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেটা এখন প্রতিযোগিতার নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আমাদের সন্তানদের শুধু দৌড়াতে শিখাচ্ছি। তাদেরকে আমরা বানাতে চাচ্ছি ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। বড় করতে চাচ্ছি টাকা উপার্জনকারী এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসাবে। কিন্তু তাদেরকে আমরা ভালো মানুষ বানাতে চাচ্ছি না। বাচ্চারা এখন পড়াশুনা করছে শুধু A+ পাবার জন্যে। তারা আনন্দের জন্য পড়ছে না; ভালো মানুষ হওয়ার জন্য পড়ছে না। তারা তোতাপাখির মতো কিছু বুলি মুখস্থ করছে। তারা পড়ছে শুধু টাকা অর্জনের জন্য। এটা নৈতিক অবক্ষয়ের মারাত্মক এক দিক।

প্রাচীন বাংলায় পাত্রীকে পাত্রস্থ করতে মেয়ে এবং মেয়ের বাবা সৎ পাত্রের খোঁজ করতো। পাত্র চরিত্রবান কি-না সেটাকে অগ্রাধিকার দিত। কিন্তু বর্তমান সমাজের পাত্রী এবং পাত্রীর পিতারা পাত্রের টাকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ একজন পাত্র সরকারী চাকরী করলেই হ'ল। সততা সেখানে গুরুত্বহীন। বাড়ি আছে কি-না, পাত্রের জমাজমি আছে কি-না ইত্যাদি বিষয় এখন প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সৎ, না অসৎ; সামাজিক জীবনে তার কোন প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে না। তরুণ প্রজন্মও হাঁটছে সেদিকে। জোর কদমে এগিয়ে চলছে তারা অজানা গন্তব্যের দিকে। তারা চলছে ভোগবাদিতার দিকে। এটা জাতির জন্য এক মহা অশনিসংকেত। তরুণ প্রজন্ম পরিণত হয়েছে মানসিক দাসে। আর মানসিক লালসা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এটা একটি দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক বিপদ সংকেত।

(৩)

সমাজের কতক লোক আবার সততার ছদ্মাবরণে আচ্ছাদিত। বাহ্যিকভাবে তারা ভালো মানুষের রূপ ধারণ করতে বেশ অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন ধর্মীয় লেবাস। এসব লেবাসধারীদের অন্তরটা শত জটিল, কুটিল আর নানা অসততায় পরিপূর্ণ। কোন কারণে যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে মতের অমিল হ'লেই তাদের খোলস বেরিয়ে পড়ে। তাদের লেবাসের অন্তরালে জমানো ঘৃণ্য চরিত্র উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে লালিত আসল চেহারা মুখের ভাষায় প্রকাশ পেতে থাকে। লেবাসের আড়ালে মূলতঃ তাদের অনৈতিকতা, অসাধুতা আর চরম নির্লজ্জতাই যাহির হয়ে পড়ে। সরকারী অফিসের অনেক ঘুষখোর আছেন যাদের মুখ দাঁড়িতে ভরা। পরণে থাকে তাদের ধর্মীয় পোশাক। আর মাথা থাকে টুপিতে ঢাকা। এই ঘুষের টাকা দিয়ে তিনি প্রতি বছর হজ্জে যান। এসব মন্দ লোকের বাইরের আবরণটা বেশ চুপচাপ ও ভদ্রতায় ভরা। কিন্তু তাদের ভিতরটা ভয়ঙ্কর নেকড়ে মানসিকতায় ভরা। সুযোগ পেলেই তারা হিংস্র হয়ে উঠে। এটাই হ'ল বর্তমান বাংলার বাস্তব সমাজচিত্র।

এ চিত্র প্রতিদিনই মানুষের আত্মাকে একটু একটু করে কলুষিত করে চলেছে। অর্থ আর স্বার্থ ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশের সামগ্রিক পরিবেশ মূল্যায়ন করে এভাবে বলা যায় যে, নৈতিকতার যদি কোন

কাঠামো ও অবয়ব থাকত, তাহ'লে এতদিনে তাকে গুম করা হ'ত কিংবা গভীর জঙ্গলে নির্বাসন দেয়া হ'ত অথবা নদীতে ডুবিয়ে চিরতরের জন্য সলিল সমাধির ব্যবস্থা করা হ'ত। সুতরাং আমরা ঘোরময় মূল্যবোধশূন্য এক অন্ধকার অমানিশাতে বসবাস করছি। দেশে টাকাওয়ালা লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। ধনীরা ক্রমশঃ ধনী হচ্ছে। তারা সম্পদের পাহাড় তৈরীতে ব্যস্ত। এক্ষেত্রে তাদের কাছে নৈতিকতার কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধনীরা প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও তারা মনে কোন শান্তি পাচ্ছে না। তারা একটু সুখ ও শান্তির জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু কোন ডাক্তারই তাদেরকে সুখী করতে পারছে না। তাদের মনের মধ্যে সুখপাখিটা যেন অধরাই রয়ে গেছে। আনন্দ, হাসি আর স্বস্তি কোনটাই তাদের মাঝে উপস্থিত নেই।

এর বিপরীতে রয়েছে নিঃস্ব, গরীব ও অসহায় শ্রেণীর মানুষ। এই গরীবেরা ক্রমশঃ গরীব হয়েই চলেছে। তাদের অবস্থাটাও ধনীদেরই মতো। তাদের কাছেও স্বাদের সুখপাখিটা অধরাই রয়ে গেছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও যেন এতটুকু শান্তি-স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই আরো 'কী' যেন পাবার নেশায় ছুটছে। সবাই দৌড়াচ্ছে সুখপাখিটা ধরতে। কিন্তু উভয় শ্রেণীই এক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। সবার মাঝেই ব্যাপক অস্থিরতা কাজ করছে। মূলতঃ এটা হ'ল অনৈতিক ভোগবাদিতার অন্ধ আসক্তি। তারা এ আসক্তিতে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একথাটি কুরআনে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ، 'ওরা হ'ল তারাই যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে খরীদ করেছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভবান হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি' *(বাক্বারাহ ২/১৬)*। ফলে তারা মূল্যবোধহীন এক বন্য পশুতে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে তারা আর মনুষ্যত্বে ফিরে আসতে পারছে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ-

'যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না, চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু শোনে না, ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

মূল্যবোধে উজ্জীবিত হ'তে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কুরআন শিক্ষিত হওয়াকে ফরয আমল (আবশ্যিক দায়িত্ব) হিসাবে গণ্য করেছে। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক ৯৬/১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'।[৩]

উল্লেখিত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষিত মানুষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আয়ত্ব করেন। যার কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। তিনি অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যান। ফলে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন হয়ে যান। আর এ উপাদানগুলোর সামষ্টিক নাম হ'ল মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধ অবলম্বনের কারণেই মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা জীবের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এ উপাদানগুলো মানুষের চেতনায় ও প্রতিভায় ঘুমন্ত থাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাই এটাকে আবিষ্কার করতে হয়। মানুষকে তার জীবন চলার প্রতিটি বাকে এটাকে চর্চা করতে হয়। জীবনের সকল সুখে, দুঃখে ও প্রেরণায় এটাকে প্রয়োগ করতে হয়। সামাজিক বিভিন্ন উদ্যোগ আর উদ্যমে এগুলোর ব্যবহার জানতে হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে এ মূল্যবোধের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ও পদক্ষেপে এটির প্রয়োগ করতে হয়।

প্রতিটি কার্যক্রমে এ উপাদানগুলোর অনুশীলন ও প্রয়োগ ঘটাতে হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা আত্মস্থ করতে হয়। আর এ উপাদানগুলোকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। মূল্যবোধের সীমা-পরিসীমা বলে কিছু নেই। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি, প্রেম-ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদিকে মূল্যবোধ বলা হয়ে থাকে। আবার ত্যাগ-তিতিক্ষা, সৌজন্য, দয়া, সাধুতা, ক্ষমা, অনুগ্রহ, উদারতা, কল্যাণচিন্তা ইত্যাদিও মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। এসব উপাদান যেসব মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছেন তাদেরকেই গুণীজন বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পিএইচ.ডিধারী হওয়া যেমন শর্ত নয়, তেমনি রাষ্ট্রের কোন বড় অফিসার হওয়াও শর্ত নয়। সমাজের যে কোন মানুষের মাঝে এ গুণাবলী পাওয়া যেতে পারে। যার মাঝে এসব গুণ পাওয়া যাবে তাকে ভালো মানুষ বা গুণী মানুষ বলা যেতে পারে। মূলতঃ উল্লেখিত গুণাবলী যাদের মধ্যে থাকে তারা ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তারা সামাজিক যে কোন কাজে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করে থাকেন। তারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে পরিচিতি পান। এসব মানুষের মধ্যে অহংকার থাকে না বললেই চলে। তাদের মধ্যে বসগিরি খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও তারা ক্ষমতার বড়াই করেন না। এসব মানুষের মধ্যে থাকে প্রকৃত দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম। তাদের কাজে ও কর্মে সেবার মানসিকতা প্রকাশ পায়। স্ব স্ব কর্মস্থল কর্মচঞ্চল, স্থির ও কর্মময় হয়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ফলে অধীনস্তদের মাঝে কর্মস্পৃহা তৈরি হয়। পারস্পরিক সহযোগী সম্পর্ক তৈরি করতে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। আর একে অপরকে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করে।

৩. *ইবনু মাজাহ হা/২২০।*

মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ শব্দটি লিখতে গেলে দু'টি শব্দের প্রয়োজন হয়। আর তা হ'ল 'মান'+'হুশ'=মানুষ। এখানে 'মান' বলতে নিজের সম্মানবোধকে বোঝানো হয়েছে। আর হুঁশ বলতে সামগ্রিক চেতনাকে বুঝানো হয়েছে। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে আছে তাকেই সাধারণত মানুষ বলা হয়ে থাকে। কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের বসবাস। আর তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ-দুই শ্রেণীর মানুষই বসবাস করছে। এদের মধ্যে যাদের মানবিক গুণাবলী রয়েছে তাদেরকে শুধুমাত্র মানুষ বলা সমীচিন।

মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত এসব গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব। মানুষের ক্রমান্বয়ে বয়স বাড়তে থাকে। আর ব্যক্তিত্ব নিরিখেই নির্ধারিত হয় তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা। পৃথিবীতে মানুষ বড়ই অনুকরণপ্রিয়। প্রত্যেক মানুষের একটি ছোটকাল থাকে। এই ছোটকাল থেকেই সে কারো না কারো অনুকরণ করতে থাকে। মনের অজান্তেই তাকে অনুসরণ করতে থাকে। এই ছোট মানুষটি বড় হয়ে তার মতো হ'তে চায়। তার কথা তার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অনুকরণীয় ব্যক্তিটি হ'তে পারে তার পিতা। হ'তে পারে তার কোন শিক্ষক। হ'তে পারে ইতিহাসের কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা অন্য যেকোন একজন। আমাদের সমাজে এ জাতীয় মানুষের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ বর্তমান সময়ের দাবী অনুযায়ী এসব মানুষের খুবই প্রয়োজন। অবশ্য যথেষ্ট আন্তরিকতা দিয়ে খুঁজলে কিছু সংখ্যক গুণী মানুষ পাওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজ থেকে গুণের কদর লোপ পেয়েছে। এ একই কারণে গুণীজনের কদরও শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে।

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে গুণীজনেরা নিজেদেরকে নিভৃতচারী করে রাখার নীতি অবলম্বন করেছেন। নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি প্রকৃত গুণীজনদের কোনঠাসা করে রেখেছে। সমাজটা অরাজকতায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সুষ্ঠু সমাজ গড়ার প্রত্যাশা করাটা দূরাশায় পরিণত হয়ে গেছে। অথচ একজন অসৎ লোকের জন্যও সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ দরকার। আর শান্তিময় সমাজ পুনঃনির্মাণে উল্লেখিত মূল্যবোধের বিকল্প নেই। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ পুনঃগঠনে প্রয়োজন মূল্যবোধের জাগরণ। আর এ জাগরণের নেপথ্যে মূল ভূমিকা রাখতে পারেন গুণীজনেরা। আর তাদের মাঠকর্মী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজ। এ দুয়ের সম্মিলিত শক্তিই কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দর করতে পারে। তাদের সমন্বিত শক্তি আর উদ্যোগই কেবল পারে সামাজিক অবক্ষয় রুখে দিতে। তারাই ফিরিয়ে আনতে পারেন বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া সততা, মননশীলতা, মানবতা আর বদান্যতা। ফিরে আসতে পারে হারানো সকল মানবীয় গুণ। তাদের মাধ্যমে বাংলা আবার পরিণত হ'তে পারে মূল্যবোধে সিক্ত এক অনুপম জনসমাজে।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) [illegible]
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : [illegible]
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
[illegible] রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : [illegible]
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী পর্ব সমূহের মধ্যে একটি হ'ল ১০ই মুহাররম তারিখে প্রচলিত আশূরা পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ পর্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পর 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী যুগের আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

আশূরার গুরুত্ব ও কারণ : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৩] সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।[৪] ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী'।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়'।[৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ'।[৭] আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম'।[৮] তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৯]

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তা'যিয়ার নামে হোসায়েনের ভুয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, তার ধুলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নীচু করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, তা'যিয়া দেওয়ার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোক বা তা'যিয়া মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, শোকের কারণে এ মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে ইন্না লিল্লাহ.. পাঠ করা এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'।[১১] তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে'।[১৩]

---

১. *বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২. *বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*
৩. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)।*
৪. *মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); মিশকাত হা/২০৬৭।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫।*
৮. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
৯. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
১০. *আবূদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২।*
১১. *বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩।*
১২. *বুখারী হা/১২৯৬।*
১৩. *বুখারী হা/১২৯১।*

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য তার লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত'।[১৪]

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেয়। একি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্ছিয়া : মর্ছিয়া (اَلْمَرْثِيَــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত (سَبْعُ مُعَلَّقَات) বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ (اَلْمَرَاثِى السَّبْعُ) 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৫]

তা'যিয়া (اَلتَّعْزِيَــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়।[১৬]

এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা। এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৪. *ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ*।
১৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই*।
১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/২৪৩, ২৫৩*।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ভূমিকা :

মানবীয় কর্ম যতই উন্নত হৌক না কেন, রচয়িতা যতই সতর্ক হৌন না কেন সেখানে ভুলভ্রান্তি কিছু থাকবে এটাই মানবীয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই সৃষ্টিগত অক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, أبى الله ان يصح كتابه إلا ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাব কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন’। শায়খ আলবানী (রহঃ) জীবনের অধিকাংশ সময় প্রভূত ধৈর্য ও উদ্দীপনা নিয়ে তাহক্বীক্বী ময়দানে লিপ্ত ছিলেন। প্রায় ৬০ বছর যাবৎ তাছনীফ, তাখরীজ, তাহক্বীক্ব ও তা‘লীকের কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন। কিন্তু তিনিও মানবীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমালোচনা ও পর্যালোচনার সম্মুখীন হওয়া থেকে রেহাই পাননি। সমসাময়িক কিছু বিদ্বানসহ একদল মানুষ তাঁর নানা সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন।

মূলত : দুনিয়ার প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির ব্যাপারে তিন শ্রেণীর মানুষ থাকে- (১) তাঁর প্রতিটি কথাকে সঠিক হিসাবে গ্রহণকারী এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রশংসাকারী। (২) তাঁর প্রতি হিংসা পোষণকারী ও মানুষের মাঝে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী। (৩) উদারপন্থী ও মধ্যমপন্থী, যারা তাঁর ভাল দিকগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তাঁর ভুলগুলো সংশোধনের প্রয়াস পান, যেন পরবর্তীগণ একই ভুলে পতিত না হন। সাথে সাথে এটাও মনে করেন যে, মানুষ হওয়ার দরুন তাঁর ভুলও হ’তে পারে। সুতরাং তাঁর ভাল কর্ম ও অপরিসীম খেদমতের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তাঁকে স্রেফ সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানান না। তবে তাঁর ভুলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করার ব্যাপারেও কোন দ্বিধা করেন না। বরং জ্ঞানী ও ইনছাফকারীদের দায়িত্ব হ’ল, সাধারণ জনগণকে এরূপ ভুলসমূহ থেকে সাবধান করা এবং ইনছাফের সাথে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর পথে নির্দেশনা দান করা। সালাফে ছালেহীন এই নীতিরই অনুসরণ করে গেছেন।

শায়খ আলবানী সম্পর্কেও উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষ পাওয়া যায়। তাই তাঁর প্রশংসাকারী ও অন্ধ অনুসারীর সংখ্যা যেমন অগণিত, তেমনি তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণকারী ও তাঁর সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়। তাই একদিকে যেমন তাঁর জীবন পরিক্রমা, চিন্তাধারা ও অবদান সম্পর্কে শতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর সমালোচনা ও ভুল-ত্রুটি বিশ্লেষণেও বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

তাঁর সমালোচকদের মধ্যে রয়েছেন প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাঊত্ব, মুছত্বফা আ‘যমী, ইসমাঈল আনছারী, আহমাদ আল-গুমারীর মত বিদ্বান। তন্মধ্যে প্রথমজন এব্যাপারে একটি সাক্ষাৎকারে বেশ কিছু সমালোচনা পেশ করেছেন।[১] যার জবাবে প্রবন্ধ লিখেছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইরশাদুল হক আছারী, যা করাচীর ‘মাসিক বাইয়েনাত’ পত্রিকার ৭৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।[২] হাবীবুর রহমান আ‘যমী স্বীয় *‘আল-আলবানী শুযূযুহু ওয়া আখত্বাউহূ’* গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু সমালোচনা তুলে ধরেছেন।[৩] আর অন্য লেখকগণ এ ব্যাপারে তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এক্ষণে সেগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমালোচনা ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল-

১. হাদীছের হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা ও নানা ভুলভ্রান্তি :

শায়খ হাবীবুর রহমান আ‘যমী ও সাইয়েদ হাসান ইবনু আলী আস-সাক্কাফ সহ কিছু বিদ্বান আলবানীর ব্যাপারে উক্ত অভিযোগ আরোপ করেছেন।

মূলত : কারো কোন ফৎওয়া বা মতামত প্রদান করার পর যদি তার নিকটে তা ভুল হিসাবে প্রতিভাত হয়, তবে তা থেকে ফিরে আসাই ন্যায়পরায়ণতার দাবী। সেকারণে ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ওলামায়ে কেরামের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হ’ল, সত্যের উপর দৃঢ় থাকা এবং ভুল থেকে ফিরে আসা, যদিও তা নিজ সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। সালাফে ছালেহীন এপথেই পরিচালিত হয়েছেন। ওমর (রাঃ) আবু মূসা আশ‘আরীর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে বলেছিলেন, ‘আপনি একদিন যে রায় প্রদান করেছেন (তাতে ভুল ধরা পড়লে) তা নিজের যথার্থ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিবর্তন করে সঠিক রায় প্রদান করতে বিলম্ব করবেন না। কেননা সত্য চিরন্তন। কোনকিছু তা বাতিল করতে পারে না। আর সত্যের দিকে ফিরে আসা বাতিলের ওপর অনড় থাকার চেয়ে বহুগুণ উত্তম’।[৪] সেকারণ ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখো সেটাই আমার মাযহাব’ যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম এ নীতির উপরেই পরিচালিত হয়েছেন।

শায়খ আলবানী তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণাকালে হাযার হাযার হাদীছের তাখরীজ করেছেন এবং হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে কোন হুকুম প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে তা ভুল সাব্যস্ত হওয়া বা কোন শক্তিশালী দলীল পাওয়ার ভিত্তিতে মত পরিবর্তন করে ভিন্ন হুকুম প্রদান করেছেন। যেমন কোন গ্রন্থে কোন হাদীছকে যঈফ বলেছেন। পরবর্তীতে তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থে বা উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবর্তন করে ছহীহ বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর

১. *ইবরাহীম যীবাক্ব, আল্লামা শায়খ শু‘আইব আরনাঊত্ব; সীরাতুহূ ফী ত্বলাবিল ‘ইলমি ওয়া জুহূদুহূ ফী তাহকীকিত তুরাছ, পৃ.* ১৯৬-২১৫।
২. *উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে মাসিক আত-তাহরীক, ২১তম বর্ষ (২০১৭-১৮ খ্রি.), ১ম -৫ম ও ১০ম সংখ্যায়।*
৩. *হাবীবুর রহমান আ‘যমী, আলবানী শুযূযুহু ওয়া আখত্বাউহূ (কুয়েত : মাকতাবা দারুল ‘আরুবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ.* ৯-১৭২।
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ.* ৮৬।

গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল العلم لا يقبل الجمود 'জ্ঞান স্থবিরতাকে গ্রহণ করেনা'।

ভুল স্বীকার এবং নিজ গ্রন্থে তা প্রকাশ করার এ নীতি শায়খ আলবানীর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। যেমন একটি ভুলের ক্ষেত্রে আলবানী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যিনি আমাকে আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন এবং আমার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। কেননা এর ফলে আমার জন্য ভুল থেকে ফিরে আসা সহজ হয়েছে। আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এবং তার মধ্যে যেগুলোর পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো এরূপ পরিবর্তনের বড় দলীল। তিনি বলেন, যারা আমার বা অন্যান্য বিদ্বানদের ভুল ধরতে চান তাদের ব্যাপারে আমার নছীহত হ'ল, আমার লেখনীর ভুল-ত্রুটি এবং সঠিক চিন্তাধারার সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন। তবে খণ্ডনের আদর্শ যেন নছীহত, পথপ্রদর্শন এবং হকের প্রতি উপদেশ হয়। হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ না হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী তা দ্বীনের মূলোৎপাটনকারী।[৫]

'যিলালুল জান্নাহ ফী তাখরীজিস সুন্নাহ' গ্রন্থে একটি হাদীছের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থের লেখক যে হাদীছের দিকে ইশারা করেছেন, তা আমি জানি না। অন্যদিকে একই গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, 'হাদীছটি ত্বাবারাণী যঈফ সনদে আবুদ্দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন- মাজমা'উয যাওয়ায়েদ (১/৩৩৩)। আমার এই ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন আব্দুল্লাহ আদ-দুওয়াইশ। আল্লাহ তার উপর রহম করুন ও তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন'।[৬]

কিছু মত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। আর কিছু পরবর্তী গবেষকগণ চিহ্নিত করেছেন। যেমন ইবনু কুতায়বা থেকে বর্ণিত হাদীছ الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون 'নবীগণ তাদের কবরে জীবিত এবং সেখানে তারা ছালাত আদায় করেন'-এর ব্যাপারে তিনি বলেন, ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনু কুতায়বা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন মনে করে আমি তা যঈফ বলে ধারণা করতাম। অতঃপর আমি মুসনাদে আবী ইয়া'লা এবং আখবারে ইস্ফাহান গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সনদ তদন্ত করে নিশ্চিত হ'লাম যে, এর সনদ 'শক্তিশালী'। ইবনু কুতায়বা কর্তৃক একক সনদে বর্ণিত বলে ধারণা করা ঠিক হয়নি। সেকারণ ইলমী আমানত আদায় ও দায়মুক্তির লক্ষ্যে আমি হাদীছটি সিলসিলা ছহীহায় সংকলন করলাম। যদিও এটা অজ্ঞ ও বিদ্বেষপরায়ণদের অন্যায় আক্রমণ, কুৎসা ও কটাক্ষের পথ খুলে দেবে। তবে যেহেতু আমি দ্বীনের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, তাই এসব সমালোচনার কোনই পরওয়া আমি করি না। বরং আমি আল্লাহ্র নিকট নেকীর আশা করি মাত্র। সুতরাং হে সম্মানিত পাঠক! আমার কোন রচনায় যদি এই তাহক্বীক্বের বিপরীত দেখতে পাও, তবে তা পরিত্যাগ কর এবং এই তাহক্বীক্বের উপরে নির্ভর কর।[৭]

অতএব এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) ভুল বুঝতে পারার পর তা থেকে ফিরে আসতে কুণ্ঠিত হন নি এবং ভুল ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তির প্রতি শুকরিয়া ও সম্মান জানাতেও কোনরূপ দ্বিধা করেননি।

উদাহরণ :

(১) কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে মত পরিবর্তন সম্পর্কে আলবানী নিজেই উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এরূপ কিছু উদাহরণ পেশ করা হ'ল।-

যঈফ থেকে ছহীহকরণ :

আদী ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, حَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ 'রাসূল (ছাঃ) মদীনার চতুষ্পার্শ্বের বার মাইল এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন। অতএব সেখানকার বৃক্ষসমূহে আঘাত করা বা কর্তন করা যাবে না। তবে উট চরানোয় বাধা নেই'। উক্ত হাদীছটির সনদে সুলায়মান ইবনু কিনান ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবি সুফিয়ান নামক দু'জন অপরিচিত রাবী থাকায় আলবানী প্রথমে হাদীছটিকে যঈফ *(যঈফ আবূদাঊদ, হা/৩৪৯)* সাব্যস্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ছহীহ মুসলিম *(হা/১৩৬৩)* সহ আরো কয়েকটি গ্রন্থে এর শাহেদ বা সমর্থক হাদীছ পাওয়ায় মত পরিবর্তন করে হাদীছটিকে 'ছহীহ' সাব্যস্ত করেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩২৩৪)*। যেমন তিনি বলেন, আবূদাঊদের উক্ত হাদীছটির সনদ যঈফ। কিন্তু পরবর্তীতে আমি এর দু'টি শাওয়াহেদ খুঁজে পেয়েছি, যার একটি ছহীহ। অতঃপর উক্ত হাদীছটি শাওয়াহেদসহ আমি 'সিলসিলা ছহীহাহ'-তে সংকলন করেছি।[৮]

হাসান থেকে যঈফকরণ :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَسْتَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي شِسْعِ نَعْلِهِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَصَائِبِ 'তোমাদের প্রত্যেকে যেন সকল কষ্টে 'ইন্না লিল্লাহি...' পাঠ করে। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও। কেননা সেটিও একটি বিপদ'।

হাদীছটির ব্যাপারে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর الكلم الطيب গ্রন্থের তাহক্বীক্বে আলবানী বলেন, হাদীছটি হাসান। ইবনুস সুন্নী হাদীছটি যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এর একটি মুরসাল শাহেদ রয়েছে।

---

৫. সিলসিলা যঈফাহ, ১/৬।
৬. ছাবাতু মুআল্লাফাতিল আলবানী, পৃ. ৬৩।
৭. সিলসিলা ছহীহাহ, ২/১৯০, হা/৬২১।
৮. ছহীহ আবূদাঊদ, ৬/২৭৬।

অতঃপর পরবর্তী সংস্করণে তিনি উক্ত বক্তব্যের সাথে যোগ করে বলেন, পরবর্তীতে আমার নিকটে স্পষ্ট হয় যে, এর সনদ 'যঈফ জিদ্দান' বা অতীব দুর্বল। আমার ইঙ্গিতকৃত শাহেদটি ভিন্ন অর্থবোধক। সিলসিলা যঈফাহ ৫৫৯৫ নম্বর হাদীছে বিস্তারিত এবং মিশকাতুল মাছাবীহ ১৭৬০ নম্বর হাদীছে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করেছি।[৯]

সিলসিলা যঈফাহ-তে উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি বলেন, এ হাদীছটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ইবনুল ক্বাইয়িম স্বীয় 'আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন। একই কথা বলেছেন তাঁর উস্তায ইবনু তায়মিয়াহ স্বীয় 'আল-কালিমুত ত্বাইয়িব' গ্রন্থে। তাদের বক্তব্যই সঠিক। যদিও তা হাদীছটির চরম দুর্বলতার ব্যাপারে প্রথমে সচেতন না থাকার কারণে আমি যে মন্তব্য পেশ করেছিলাম তার বিরোধী (অর্থাৎ হাদীছটি হাসান সাব্যস্ত করে আমি ভুল করেছিলাম)। সেকারণ আমি দ্রুততার সাথে আমার নিজেকে ও আমার গ্রন্থের পাঠকগণকে নছীহতমূলকভাবে বলতে চাই যে, আমি আমার এ ভুলের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এর দায় সবটাই আমার। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[১০] অর্থাৎ হাদীছটি 'হাসান' নয়, বরং যঈফ।

হাসান থেকে ছহীহকরণ :

'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ৩৭৫ নং হাদীছে বলা হয়েছে যে, একবার এক বৃদ্ধা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি আমার জন্য জান্নাত লাভের দো'আ করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে ওমুকের মা! জান্নাতে তো কোন বৃদ্ধ মানুষ প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা খুবই উৎকণ্ঠিত হ'লেন এবং কখনোই তিনি জান্নাতে যেতে পারবেন না ভেবে কাঁদতে শুরু করলেন। বৃদ্ধার অবস্থা দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কোন বৃদ্ধা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহ তাদেরকে নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবেন। ফলে তারা পূর্ণযৌবনা ও কুমারী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়ে শোনালেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا (আমরা তাদেরকে (জান্নাতী নারীদের) সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। অতঃপর তাদেরকে আমরা করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়সী)।

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আলবানী বলেন, হাদীছটি আমি সিলসিলা ছহীহাহ ২৯৮৭ নং হাদীছে إن الجنة لا يدخلها عجوز শব্দে উল্লেখ করেছি। তবে আমি হাদীছটি গায়াতুল মারামসহ কিছু রচনায় হাসান হিসাবে উল্লেখ করেছি। অতএব উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীছ এবং উক্ত আয়াতের তাফসীরে যা বর্ণিত হয়েছে তার কারণে হাদীছটি আরো শক্তিশালী হয়েছে।[১১]

শব্দে বা স্থানে ভুল সংশোধন :

কোন কোন স্থানে আলবানী তাঁর অন্য গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীছের বিভিন্ন ভুল সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন ছহীহুল জামে' হা/৭৫৯৯-এ তিনি জাবির (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ 'কোন নারীর সাথে কোন গৃহে তার সাথে বিবাহিত স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত কেউ যেন রাত্রি যাপন না করে' হাদীছটি এনে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে একই অর্থবোধক হাদীছ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৮৬-এ সংকলন করেছেন أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أو مَحْرَمًا '(কোন বিবাহিতা নারীর সাথে তার স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত কেউ যেন রাত্রি যাপন না করে)' শব্দে। অতঃপর তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীছে امرأةٍ ثيب শব্দ এসেছে। যা ছহীহ মুসলিম, তারীখু বাগদাদ ও বায়হাক্বীর রেওয়ায়াতে এসেছে। আর আবূ ইয়া'লা ও ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে, امرأة في بيت। বায়হাক্বীর একই রেওয়ায়াত ইবনু আবী শায়বা ও নাসাঈতে এসেছে। কিন্তু সেখানে امرأة في بيت ، أو ثيب কোন শব্দই নেই। তবে সম্ভবত মুসলিমের রেওয়ায়াতটি আসমা বিনতে 'উমাইসের হাদীছের অনুরূপ হওয়ায় তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

তবে ইমাম সুয়ূত্বী স্বীয় জামি' ছগীরে আবু ইয়া'লার বর্ণনামতে امرأة في بيت শব্দে হাদীছটি এনেছেন। কিন্তু সূত্র হিসাবে ছহীহ মুসলিমের নাম উল্লেখ করেছেন। একইভাবে এসেছে ফাৎহুল ক্বাদীরে।[১২]

(২) কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে মত পরিবর্তনের ব্যাপারে আলবানী নিজে উল্লেখ করেননি। বরং পরবর্তী গবেষকগণ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশনার তারিখ পর্যবেক্ষণ করে পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্তসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং মত পরিবর্তনের বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন।

এরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উপায় হ'ল, পূর্বে ও পরবর্তীতে রচিত ও পুনরায় তাহক্বীক্বকৃত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। যেমন غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام গ্রন্থে আলবানী মোট ৯০টি হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ২৬টি হাদীছের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তিনি ছহীহ বা হাসান সাব্যস্ত

৯. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-কালিমুত তাইয়েব (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১২৭।*
১০. *সিলসিলা যঈফাহ, ১২/২০২, হা/৫৫৯৫।*
১১. *আবুল হাসান আশ-শায়খ, তারাজু'উল 'আল্লামা আল-আলবানী, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৭১-৭২।*
১২. *সিলসিলা ছহীহাহ, ৭/২২৫-২৭।*

করেছেন। ضعيف الجامع الصغير গ্রন্থে সংকলিত যঈফ হাদীছসমূহের মধ্যে ১৬১টি হাদীছকে তিনি পরবর্তীতে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। صحيح الجامع الصغير গ্রন্থের ৮৫টি হাদীছকে তিনি পরবর্তীতে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب গ্রন্থের ৭টি স্থানে হাদীছ ও ফিক্বহী বিষয়ে পরবর্তীতে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। تخريج أحاديث مشكلة الفقر গ্রন্থে ১২টি হাদীছ তিনি যঈফ বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ৬টি হাদীছকে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। মিশকাতুল মাছাবীহ-এর ১৫৪টি হাদীছের ব্যাপারে পরবর্তীতে মত পরিবর্তন করেছেন। এছাড়া মিশকাতুল মাছাবীহ, ইরওয়াউল গালীল, মুখতাছারুশ শামাইল, গায়াতুল মারাম প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (তাহক্বীক্ব ছানী) প্রকাশিত হয়েছে।[১৩]

উদাহরণ :

ছহীহ থেকে যঈফকরণ :

আলী (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত আছার أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان فقال له عمر متى ذلك يا علي قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة। আলবানী আছারটিকে ছহীহ সাব্যস্ত করে ছহীহুত তারগীবের (হা/১০৭৬) অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গ্রন্থটির তৃতীয় প্রকাশ পর্যন্ত তা এভাবেই ছিল। অতঃপর দারুল মা'আরিফ থেকে নতুনভাবে ১ম সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং ছহীহুত তারগীব থেকে যঈফুত তারগীবে (হা/৮৮) স্থানান্তর করেন।[১৪]

যঈফ থেকে ছহীহকরণ :

ইবনু মাস'ঊদ থেকে মারফূ' সূত্রে সুনান তিরমিযীতে সংকলিত হাদীছ اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي : أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد 'তোমরা আমার পরের দুইজন ব্যক্তির অনুসরণ কর। একথা বলে তিনি আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর দিকে ইশারা করেন। আর তোমরা আম্মারের অনুসৃত পন্থা অনুসরণ কর এবং যে হাদীছ ইবনু মাস'ঊদ তোমাদের কাছে বর্ণনা করে তা বিশ্বাস কর'। আলবানী হাদীছটি মিশকাতুল মাছাবীহ-এর ৬২২১ নং হাদীছের তাহক্বীক্বে যঈফ সাব্যস্ত করে বলেন, এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনু সালামা নামে একজন যঈফ রাবী রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত ছহীহুত তিরমিযীতে এবং সিলসিলা ছহীহায় এটি ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৫]

সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকৃত হাদীছসমূহ নিয়ে প্রকাশিত বইসমূহ :

শায়খ আলবানীর এরূপ মত পরিবর্তন নিয়ে গবেষকগণ ইতোমধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে একজন হ'লেন আব্দুল বাসিত ইবনু ইউসুফ। তার সংকলিত গ্রন্থটি হ'ল, التنبيهات المليحة على ما تراجع عنه الألباني من الأحاديث الضعيفة أو الصحيحة।[১৬] এখানে তিনি কয়েকটি ভাগে আলোচনা পেশ করেছেন। ১ম ভাগে ঐ হাদীছসমূহ এনেছেন, যেখানে মত পরিবর্তনের বিষয়টি আলবানী নিজেই উল্লেখ করেছেন। ২য় ভাগে এনেছেন যে হাদীছসমূহ ভুলবশত কোন ছহীহ বা যঈফ সংকলনে থেকে গেছে। ৩য় ভাগে ঐ হাদীছগুলো এনেছেন, যেগুলো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশনার তারিখ পর্যবেক্ষণ করে, পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে মত পরিবর্তনের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

শায়খ 'আওদা ইবনুল হাসান এরূপ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকৃত ৫০০ হাদীছ নিয়ে রচনা করেছেন ٥٠٠ حديث مما تراجع عنهم العلامة المحدث الألباني في كتبه। অপর গবেষক আবুল হাসান মুহাম্মাদ হাসান আশ-শায়খ রচনা করেছেন تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحًا وتضعيفًا ويليه تراجعه فيما ينص عليه مع زيادات ١٧٧ موضعا। এখানে তিনি মোট ৮২৬ টি হাদীছ সম্পর্কে দুই অধ্যায়ে আলোচনা পেশ করেছেন।[১৭] ১ম অধ্যায়ে যেসব হাদীছে মত পরিবর্তনের বিষয়ে আলবানী নিজেই আলোচনা করেছেন, সেগুলো চারটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। (১) যঈফ থেকে ছহীহকরণ (২) ছহীহ বা হাসান থেকে যঈফকরণ (৩) ছহীহ থেকে হাসান বা হাসান থেকে ছহীহকরণ (৪) হাদীছের বিভিন্ন শব্দে বা স্থানে সংঘটিত কিছু ভুল শুদ্ধিকরণ।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও ভুলভ্রান্তির সমালোচনায় রচিত বইসমূহ :

অনেক সমালোচক তাঁর এই মতপরিবর্তনকে পুঁজি করে তাঁর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা ও গীবত- তোহমত পেশ করেছেন, বইপুস্তক রচনা করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাহক্বীক্বী ময়দানে তাঁর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

তাঁর সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচক ছিলেন সাইয়েদ হাসান ইবনু আলী আস-সাক্কাফ। এ বিষয়ে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন তা হ'ল تناقضات الألباني

১৩. *মুহাম্মাদ আহমাদ উওয়াইস, মানহাজুল আলবানী ফীত তাখরীজ ওয়া বায়ানিহ ছুন'আতিল হাদীছিইয়াতি ফীহি (কায়রো : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৬৩-৬৪।*

১৪. *আব্দুর রহমান আন-নাজদী, ৫০০ হাদীছুন মিম্মা তারাজা'আ 'আনহাল আলবানী ফী কুতুবিহী, (জর্দান : দারুন নাফাএস, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১২৬।*

১৫. *তারাজু'উল 'আল্লামা আল-আলবানী, ২/২২০-২১।*

১৬. *এটি আম্মানের দারুদ দবী থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।*

১৭. *রিয়াদস্থ মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।*

الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات- তিন খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটিতে তিনি আড়াই শতাধিক হাদীছের ব্যাপারে তার ভাষায় আলবানীর تناقضات বা স্ববিরোধী হুকুমসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া ইলমুল হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর নানা ভুল নিয়ে বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করেছেন।[১৮]

একইভাবে সমালোচনা পেশ করেছেন হিন্দুস্তানী বিদ্বান শায়খ হাবীবুর রহমান আ'যমী। তিনি তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ الألباني شذوذه وأخطاؤه -তে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলবানীর সমালোচনা করেছেন।[১৯] ভারত, মিসর, লেবাননসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তা ছাপা হয়। এমনকি জর্দানের বিভিন্ন অঞ্চলে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।[২০]

এছাড়া সিরীয় বিদ্বান শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ লিখেছেন كلمات في كشف أباطيل وافتراءات[২১] এবং শায়খ আব্দুল্লাহ হারারীর একদল ছাত্র সংকলন করেছেন تبيين ضلالات الألباني شيخ الوهابية المتمحدث।[২২]

এসব সমালোচনার নিন্দনীয় দিক হ'ল, অধিকাংশ সমালোচক প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমী সমালোচনার চেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ হীন সমালোচনার দিকে অগ্রগামী হয়েছেন। মত পরিবর্তনের মাধ্যমে আলবানী যে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে তারা তাঁর স্ববিরোধিতা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

সমালোচনার জবাবে রচিত বইসমূহ :

আলবানীর সমালোচনায় যেমন নানা রচনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তার জবাবেও অনেক বই লেখা হয়েছে। যেমন- (১) হাবীবুর রহমান আ'যমীর সমালোচনার জবাবে আলবানী নিজে রচনা করেছেন الرد علي رسالة أرشد السلفي। (২) আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ-এর সমালোচনায় আলবানী লিখেছেন, كشف النقاب عما في كتاب أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات (৩) সালীম হেলালী লিখেছেন, الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي المدعي بأنه أرشد السلفي في رده على الألباني وبيان افترائه عليه[২৩] (৪) শায়খ আলী হাসান আল-হালাবী রচনা করেছেন الأنوار الكاشفة لتناقضات الخساف الزائفة وكشف ما فيها من الزيغ والتحريف الرد البرهاني في الإنتصار للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني[২৪] والمجازفة التوفيق الرباني في الذب عن العلامة الألباني[২৫] (৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ফাহাদ আল-খালীফী রচনা করেছেন, ردع الجاني المتعدي على الألباني,[২৬] (৬) আবু মু'আয তারেক ইবনু 'আওযিল্লাহ রচনা করেছেন।

সমালোচনার কিছু উদাহরণ ও তাঁর জবাব :

(ক) আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا '(আমার পরে) মানুষ তো তোমাদের অনুসারী হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য তোমাদের নিকটে আসবে। তারা তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনা কর'।[২৭]

হাসান সাক্কাফ বলেন, আলবানী হাদীছটি সিলসিলা ছহীহাহ (হা/২৮০)-তে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, একই রাবী থেকে বর্ণিত একই হাদীছকে তিনি মিশকাতুল মাছাবীহ (হা/২১৫)-এর তাহক্বীক্বে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ হিসাবে বলেছেন, তিরমিযী বলেছেন যে, এর সনদে আবু হারূণ আল-'আবাদী রয়েছেন, শু'বা যাকে যঈফ গণ্য করেছেন। আমার (আলবানী) মতে, তার নাম আম্মারা ইবনু জুওয়াইন। সে খুবই দুর্বল। কিছু ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আলবানীর এ বক্তব্য উল্লেখের পর সাক্কাফ বলেন, হায়! কি স্ববিরোধিতা!![২৮]

এর জবাবে আলবানী বলেন, আমি সিলসিলা ছহীহাহ (হা/২৮০)-তে আবু নাযরা ও অন্যান্য রাবী থেকে আবু সাঈদ সূত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণিত হাদীছটি শক্তিশালী গণ্য করেছি, যেখানে বলা হয়েছে, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم؛ يعني: طلبة الحديث 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের তথা হাদীছের জ্ঞানান্বেষীদের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন'। আর মিশকাতে যঈফ গণ্য করেছি মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত হারূণ 'আবাদী থেকে আবু সাঈদ সূত্রে অনেক দীর্ঘ বাক্যে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছকে। যেখানে বলা হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বললেন, إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار

---

১৮. *আম্মান : আল-মাকতাবাতুল মুখাসসাসাহ লির রাদ্দি 'আলাল ওয়াহহাবিয়াহ, ১১তম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.।*
১৯. *কুয়েত : মাকতাবাতু দারিল 'আরূবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি./১৪০৪ হি.।*
২০. *সালীম হেলালী, আর-রাদ্দুল 'ইলমী 'আলা হাবীবির রহমান আল-আ'যমী, ১ম খণ্ড (আম্মান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৫।*
২১. *হালব : মাকতাবাতুল মাতবূ'আতিল ইসলামিইয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি.।*
২২. *বৈরুত : দারুল মাশারী', ৩য় প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.।*
২৩. *আম্মান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.।*
২৪. *জর্দান : দারুল আছালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.।*
২৫. *আজমান, আরব আমিরাত : মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.।*
২৬. *কায়রো : মাকাতাবাতুত তারবিয়াতুল ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.।*
২৭. *তিরমিযী, হা/২৬৫০, ৬/১৫০।*
২৮. *হাসান সাক্কাফ, তানাকুযাতুল আলবানী আল-ওয়াযিহাহ (স্থানবিহীন, আল-মাকতাবাতুল মুতাখাছছাছাহ লির রাদ্দি 'আলাল ওয়াহহাবিইয়াহ, ১১তম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬০।*

الأرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا ‘জনসাধারণ তোমাদের অনুসারী হবে। আর দিক-দিগন্ত হ’তে তারা তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। সুতরাং যখন তারা আসবে, তখন তোমরা তাদের সদুপদেশ দিবে’। উভয় হাদীছের সনদ ও মতনে এত পার্থক্য থাকায় উভয় হাদীছকে ছহীহ ও যঈফ গণ্যের মাঝে পার্থক্য হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ উক্ত অন্যায়কারী ব্যক্তিটি একে স্ববিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করছেন! অতএব চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন![২৯]

(২) হাসান সাক্কাফ বলেন, রাবী جُرَي بن كُليب النهدي الكوفي এর ব্যাপারে আলবানী বলেছেন, তার থেকে أبو إسحاق السَّبيعي ব্যতীত অন্য কেউ হাদীছ বর্ণনা করেননি। অথচ একথা সঠিক নয়। বরং আবু ইসহাক্ব ব্যতীত অন্য রাবীও তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু হাজার স্বীয় তাহযীবে বলেন, জুরাই ইবনু কুলাইব থেকে يونس بن عاصم بن أبي النجود ও أبي إسحاق বর্ণনা করেছেন এবং তা মুসনাদে আহমাদে সংকলিত হয়েছে। আলবানীর এরূপ সিদ্ধান্তের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণ হ’ল, কেবলমাত্র মীযানুল ই‘তিদালের উপর নির্ভর করা।[৩০]

আব্দুল্লাহ ইবনু ফাহদ আল-খালীফী বলেন, এখানে আলবানী যা বলেছেন, সেটাই সঠিক। বরং হাসান সাক্কাফ ভুল করেছেন। কেননা জুরাই ইবনু কুলাইব নামে দু’জন রাবী আছেন। একজন কূফী, যার থেকে কেবল أبو إسحاق السبيعي বর্ণনা করেছেন। অপরজন বাছরী, যার থেকে قتادة বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইমাম আবূদাঊদ বলেছেন। আর তার থেকে অপর বর্ণনাকারী يونس بن أبي إسحاق বাছরী, তিনি কূফী নন। যেমন মুসনাদে আহমাদে তাকে নাহদী বলা হয়েছে। আর নাহদী হ’লেন বাছরী, যার থেকে ক্বাতাদাহ বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি ইবনু হিব্বান স্বীয় ‘ছিক্বাতে’ এবং ইবনু হাজার স্বীয় ‘তাহযীবে’ বর্ণনা করেছেন। আলবানীর পূর্বে ইমাম বুখারী জুরাই ইবনু কুলাইব আন-নাহদীর জীবনীতে তার থেকে ক্বাতাদার বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১] যা প্রমাণ করে যে তিনি মনে করতেন যে নাহদী মূলত বাছরী।[৩২] অতএব উক্ত রাবীর ক্ষেত্রে আলবানীর বক্তব্যই সঠিক। হাসান সাক্কাফ একই নামের দু’জন রাবীকে এক মনে করে আলবানীর ভুল প্রমাণের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন মাত্র।

এরূপ বিভ্রান্তিকর সমালোচনার জন্য আলবানী হাসান সাক্কাফের উদ্দেশ্যে নছীহতস্বরূপ বলেন, আমি তার জন্য কিছু কোমল কথা বলতে চাই। হয়তো তিনি উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন এবং ভীত হ’তে পারেন। প্রথমত আপনি কি মা‘ছূম? ইলমের ক্ষেত্রে কি আপনার কখনোই ভুল হয় না? যদি তিনি বলেন, তিনি মা‘ছুম নন, তারও ভুল হয়, আর মুমিনের জন্য এ জবাব দেওয়াই ওয়াজিব।

দ্বিতীয় যে কথা আমি বলব তা হ’ল- আপনার নিকটে (কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদানের পর) পরবর্তীতে যদি কিছু সঠিক প্রমাণিত হয়, তখন কি আপনি আলবানীর ন্যায় সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসবেন, না ভুলের উপরেই অটল থাকবেন? যদি আপনি ইতিবাচক জবাব দেন, যেটা মুমিনের জবাব, তাহ’লে আলবানী সঠিক সিদ্ধান্তে ফিরে আসলে কেন আপনি তাকে এর প্রতি সদা-সর্বদা উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাঁর ভুল হিসাবে গণ্য করছেন? যদিও এটা আল্লাহ্র একান্ত দান, যার জন্য আপনার মতো ব্যক্তির উৎসাহের কোন প্রয়োজন নেই।.... বরং আমি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যেন হাদীছ ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে আমার খেদমতের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করেন, এক্ষেত্রে আমার ভুলসমূহ শুদ্ধ করার সুযোগ দেন এবং এই খেদমতকে বিচার দিবসে আমার পাপ মোচনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন।[৩৩]

তবে অনেক লেখক আলবানীর তাখরীজকৃত হাদীছের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা পেশ করেছেন। তারা আলবানীর কিছু কিছু ভুল যথার্থভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন শায়খ ফাহদ আস-সুনাইদ রচনা করেছেন الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام، تعقبات حديثية على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني। এখানে তিনি তাঁর তাখরীজকৃত ২৫টি হাদীছের ব্যাপারে ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেছেন।[৩৪] এছাড়া শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আদ-দুওয়াইশ রচনা করেছেন تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني।[৩৫] এটি আলবানীর ভুল-ত্রুটি পর্যালোচনার উপর সবচেয়ে উপকারী গ্রন্থ। এছাড়া প্রফেসর আনাস সুলায়মান মিছরী রচনা করেছেন الأحاديث المعلولة التي صححها الألباني على شرط الشيخين। যেখানে তিনি মোট ২২টি ত্রুটিযুক্ত হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যেগুলো আলবানী বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[৩৬]

(ক্রমশঃ)

---

২৯. *সিলসিলা ছহীহাহ, ১/১৫, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*
৩০. *তানাক্বযাতুল আলবানী আল-ওয়াযিহাহ, ১/১৯৬।*
৩১. *মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, ২য় খণ্ড (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা‘আরিফ আল-‘উছমানিইয়াহ, তাবি), পৃ. ২৪৪, রাবী নং ২৩৩৬।*
৩২. *আব্দুল্লাহ ইবনু ফাহদ আল-খালীফী, তাওফীকুর রব্বানী ফিয যাব্বি ‘আনিল আলবানী (প্রকাশক ও তারিখ বিহীন), পৃ. ৫২।*
৩৩. *সিলসিলা ছহীহাহ, ৭/৩৭১, হা/৩১৩৩।*
৩৪. *কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।*
৩৫. *আল-কাছিম : দারুল ‘আয়লান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি.।*
৩৬. *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাযা কর্তৃক প্রকাশিত মাজাল্লাতুল জামি‘আহ লিদ দিরাসাতিল ইসলামিইয়াহ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, ২৬ তম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ২১৭-২৪৪। https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/2762, 21.05.2019*

অর্থমন্ত্রীরা যেভাবে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেন

*-শওকত হোসেন**

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল মোশতাক আহমদের মন্ত্রীসভায়। তবে ঘোষণাটি আসে জিয়াউর রহমানের সময়ে। ১৯৭৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালের শিল্পনীতি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত সেই শিল্পনীতিতে অব্যবহৃত ও নিষ্ক্রিয় তহবিল উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করলে কোন প্রশ্ন করা হবে না বলে জানানো হয়েছিল। তবে সরাসরিভাবে কালোটাকা সাদা করার ঘোষণাটি ছিল ১৯৭৫ সালে জারী করা সামরিক আইনের ৬ নম্বর আদেশে। সেখানে ২৫ শতাংশ কর দিয়ে 'কর-অনারোপিত আয়' সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারী পর্যায়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া সেই শুরু। শুরুতে কিছুটা রাগঢাক থাকলেও গত দুই দশকে তা দেওয়া হয়েছে অবাধে, ঢালাওভাবে।

বছরের পর বছর কালোটাকার মালিকদের সুযোগ দিলেও অর্থ সাদা হয়েছে কমই। আবাসন ও শেয়ারবাজারের ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর সব ব্যবসায়ী সংগঠনই প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে আসছে। অর্থনীতিবিদেরা একে অনৈতিক বলে মনে করেন। সৎ করদাতারা ক্ষুব্ধ হন।

এমনকি সংবিধানের ২০ (২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না'। তারপরও কোন মহলের চাপে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়, সে এক রহস্য।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অবশ্য একবার এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। ২০০৯ সালের জুনে বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া অনৈতিক।... কিন্তু পলিটিকস ইজ হাইয়েস্ট আর্ট অব কম্প্রোমাইজ। রাজনীতিতে সব ধরনের মানুষ ও সব ধরনের স্বার্থকে সমন্বয় করে চলতে হয়। ফলে দুঃসাহসিক অভিযানে না নেমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই শ্রেয় হয়ে পড়ে'।

একই সুযোগ শেয়ারবাজারের জন্যও রাখা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অবশ্য অর্থমন্ত্রী কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নতুন এক অধ্যায়ে নিয়ে গেছেন। এবার টাকা পাচারকারীরা প্রথমবারের মতো বিশেষ সুযোগটি পেয়েছে।

শুরুটা ছিল অন্য রকম :

বাংলাদেশ কিন্তু যাত্রা শুরু করেছিল কালোটাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েই। ১৯৭৫ সালের ৬ই এপ্রিল সরকার এক ঘোষণায় ১০০ টাকার নোট অচল করে দিয়েছিল। তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এ আর মল্লিক। ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, 'মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রশমিত করা এবং অর্থনীতিতে কালো ও বাড়তি টাকার অশুভ প্রভাব দূর করা'। ঘোষণার পরের তিন দিন ১০০ টাকার নোট জমা নেওয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্ত বেশী দিন ধরে রাখা যায়নি। বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যার পরে আসা মোশতাক সরকার অনেকেরই টাকা ফেরত দিয়ে দেয়।

সামরিক শাসনের সময়ে যেভাবে শুরু :

বাজেট বক্তৃতায় কালোটাকা সাদা করার কথা প্রথম স্থান পায় ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে। ১৯৭৭ সালের ২৫শে জুন ঐ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'আপনারা অবগত আছেন যে, সরকার ৬ নম্বর সামরিক আইনের অধীনে করদাতাদের তাঁদের কর-অনারোপিত প্রকৃত আয়ের ঘোষণার জন্য ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অনেকে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি বলে আবেদন-নিবেদন বিবেচনা করে সরকার তাঁদের কর-অনারোপিত প্রকৃত আয়ের ঘোষণার জন্য এ বছর ৩০শে জুন পর্যন্ত আর একবার সুযোগ দিয়েছেন। আশা করা যায় যে, করদাতারা তাঁদের এখনো অপ্রকাশিত আয় ঘোষণার এই শেষ সুযোগ হারাবেন না। কেননা এর পরে কর ফাঁকির কেসসমূহের ব্যাপারে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও সেই আইনানুগ ব্যবস্থা আর কখনো নেওয়া হয়নি।

এরপর ১৯৮১-৮২ অর্থবছরের বাজেটে আবারও কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেন তখনকার অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। নতুন করদাতারা পুঁজির এক-চতুর্থাংশ নিট আয় দেখালে বিনিয়োগের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না বলে ঘোষণা দেন তিনি।

আবারও সামরিক শাসন ও এরশাদ-পর্ব :

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক আইন জারী করেন লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। সেই সামরিক আইনের ৫ নম্বর ধারায় ১৫ শতাংশ কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ সুযোগ থাকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত।

এরপর ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান যেকোন অঙ্কের আয় দেখিয়ে ২০ শতাংশ আয়কর দিলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। এর পরের দুই অর্থবছরে করের হার কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল।

এরশাদ আমলে ১৯৮৩ সালে নতুন এক পদ্ধতিতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময়ে 'দ্য বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট' নামে সঞ্চয়পত্র ধরনের একটি সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছিল। এই সার্টিফিকেট কিনতে ক্রেতার নাম লিপিবদ্ধ রাখা হ'ত না, কেবল একটি কোড নম্বর থাকত। এই পদ্ধতি ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে চালু ছিল।

যে পাঁচ বছরে সুযোগ ছিল না :

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ সরকারের পতনের পর সরকার গঠন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আবারও অর্থমন্ত্রী হন এম সাইফুর রহমান। প্রথম বাজেটেই (১৯৯১-৯২ অর্থবছর) সাইফুর রহমান বলেছিলেন, 'বিগত বছরগুলোতে কালোটাকা বৈধ করার যে ধরনের বৈষম্যমূলক কর দায়মুক্তির সুবিধা দেওয়া হয়েছে, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ও গোষ্ঠী স্বার্থপ্রসূত বৈষম্যমূলক করনীতি আমাদের এ গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণ পরিহার করবে'। ঐ পাঁচ বছরে আনুষ্ঠানিকভাবে কালোটাকা বৈধ করার সুযোগ আর দেওয়া হয়নি।

নতুন নতুন পথ :

২১ বছর পরে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে নতুন অর্থমন্ত্রী হন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। তাঁর সময়ে

কালোটাকা সাদা করার নতুন নতুন পথ বের করা হয়েছিল। যেমন ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের বাজেটে তিনি বলেছিলেন, '১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেউ নতুন শিল্পে বিনিয়োগ করলে কোন প্রশ্ন করা হবে না। এছাড়া ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগকারী নতুন করদাতারা যদি তাঁদের পুঁজির কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ আয় দেখান, তাহ'লেও এর উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না'।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাজেটে শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেছিলেন, 'বিনিয়োগের ক্ষেত্র কেবল নতুন শিল্পতে সীমিত রাখার কারণে করদাতাদের নিকট হ'তে তেমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি'। তারপরও তিনি ১০ শতাংশের পরিবর্তে সাড়ে ৭ শতাংশ কর দেওয়া সাপেক্ষে একই সুযোগ রেখে দেন। তবে ব্যতিক্রমী ও অভিনব ঘোষণা ছিল ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেটে। এ সময় দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিলাসবহুল গাড়ি কিনে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্ট কিনে প্রতি বর্গমিটার অনুযায়ী আয়কর দিলে তাও বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার কথা বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী। এমনকি যাত্রীবাহী নৌযান, তাপানুকূল বিলাসবহুল বাসসহ সব ধরনের নতুন যানবাহনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়। তারপরও তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আরও সহজ করে দেন।

এবার সুযোগ দিলেন তিনিও :

২০০১ সালে বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসে। তখনো অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান অবাধে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যেমন, ২০০২-০৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের অর্থনীতিতে বিপুল অঙ্কের কর অনারোপিত আয় রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ধরনের আয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন বিশেষ সুবিধা না থাকায় করদাতারা যেমন একদিকে এ আয় ঘোষণায় উৎসাহিত হচ্ছেন না এবং অন্যদিকে তা উৎপাদনশীল খাতেও বিনিয়োগ হচ্ছে না। যার ফলে শিল্পায়নসহ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে প্রত্যাশিত গতিশীলতা আসছে না। এরপর তিনি ২০০৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে যেকোন অঙ্কের বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে এবং শর্তহীনভাবে গ্রহণের সুযোগ দেন।

২০০৩-০৪ অর্থবছরে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকেও বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আবার বাজেটে উল্লেখ না থাকলেও ২০০৪ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পরিপত্র জারী করে নতুন গাড়ি কিনে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেয়।

আতঙ্কের সময় :

২০০৭ সালে জারী করা হয় যরূরী অবস্থা। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। তখন চলছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান। গ্রেপ্তার হচ্ছিলেন রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। এ সময়েই বাজেটের আগে সরকারের ভাষায় অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়। সুযোগটি না নিলে সর্বোচ্চ ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানার কথাও বলা হয়েছিল।

এবার স্থায়ী পদ্ধতি ও মহোৎসব :

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠন করলে অর্থমন্ত্রী হন আবুল মাল আবদুল মুহিত। দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন, কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আর দেওয়া হবে না। কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ঠিকই ১০ শতাংশ হারে কর দিয়ে ফ্ল্যাট, বাড়ি, পুঁজিবাজার, শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো খাতে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়।

এরপর ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটেও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে 'বাংলাদেশ অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিলে' ১০ শতাংশ হারে কর দিয়ে বিনিয়োগ করলে এ সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। পরের অর্থবছরের বাজেটে ভাড়ায় চালিত যানবাহন কিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়কর দিলেই তা তখন বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার সুযোগ খানিকটা কঠিন করা হয়।

কালোটাকার মালিকদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্থবছর হচ্ছে ২০১২-১৩। এই অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় কোন কিছু উল্লেখ না করেই আয়কর আইনে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ চিরদিনের জন্য স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এজন্য আয়কর অধ্যাদেশে ১৯ (ই) নামে নতুন একটি ধারা সংযোজন করা হয়। এ ধারা অনুযায়ী, অতীতের যেকোন বছরের আয় গোপন করা হয়ে থাকলে ১০ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়েই তা বৈধ করা যাবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আরেকটি স্থায়ী পদ্ধতি আয়কর অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর সেটি হচ্ছে 19 BBBBB। এর মাধ্যমে ফ্ল্যাট ও জমি কিনে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

নতুন অধ্যায় :

২০১৯ সালে নতুন করে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে এবার অর্থমন্ত্রীর বদল হয়। তবে নীতি থাকে আগের মতোই। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে নতুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আইটি পার্ক, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আবাসন খাতে ১০ শতাংশ আয়কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ রাখেন। তবে ব্যতিক্রমী সময় ছিল ২০২০-২১ অর্থবছর। সেটি ছিল ঢালাওভাবে কালোটাকা সাদা করার সুযোগের বছর। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এ নিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের প্রচলিত আইনে যা-ই থাকুক না কেন, ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত জমি, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি বর্গমিটারের ওপর নির্দিষ্ট হারে এবং নগদ অর্থ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, বন্ড বা যেকোন সিকিউরিটিজের ওপর ১০ শতাংশ কর প্রদান করে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।

একই সুযোগ শেয়ারবাজারের জন্যও রাখা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নতুন এক অধ্যায়ে নিয়ে গেছেন। এবার টাকা পাচারকারীরাও প্রথমবারের মতো বিশেষ এই সুযোগটি পেয়েছে।

শেষ কথা :

ভারতীয় বংশোদ্ভূত রোহিনতন মিস্ত্রি তাঁর ফ্যামিলি ম্যাটার্স উপন্যাসে লিখেছেন, 'কালোটাকা সাদা অর্থনীতিরই একটা বড় অংশ, মস্তিষ্কের ঠিক কেন্দ্রে একটি টিউমারের মতো। এটাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং রোগীকে মেরে ফেলুন'। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীরা রোহিনতন মিস্ত্রির এই কথাটাই সম্ভবত মনেপ্রাণে মানেন। তাই তাঁরা কখনোই অর্থনীতি থেকে কালোটাকা সরানোর কার্যকর চেষ্টা করেননি। বরং নানাভাবে কালোটাকা বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলে কালোটাকা কমেনি, বরং বেড়ে গেছে।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সহনশীলতা ও বিনয়-নম্রতার অনন্য নিদর্শন

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আবু ইবরাহীম আল-মাযানী বলেন, আমাকে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট হাদীছ শুনতাম তখন আমার বয়স ছিল ১৪ বছর। একবার ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মজলিসে সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, মুসলিম ইবনু খালিদ আয-যানজী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে সেখানে দু'জন ব্যক্তি আসল এবং তাদের একজন বলল, আমি একজন টিয়া পাখি বিক্রেতা। আমি এ লোকটির নিকটে একটি টিয়া পাখি বিক্রি করেছি এবং আমার স্ত্রীর তালাকের শপথ করে বলেছি যে, পাখিটির ডাক কখনো বন্ধ হবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর লোকটি এসে জানাল যে, পাখিটি নীরব হয়ে আছে, ডাকছে না। বলে সে পাখিটা ফেরত দিল। সুতরাং আমার শপথ তো ভেঙ্গে গেল। এখন আমি (স্ত্রীর ব্যাপারে) কী করতে পারি? এ কথা শুনে ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ঐ দু'জন লোক বের হয়ে গেলে আমি উক্ত পাখি বিক্রেতাকে ডেকে বললাম, আপনি কিভাবে শপথ করেছিলেন? বিক্রেতা বলল, তুমি যেমনটা শুনেছ। এরপর আমি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কথার উদ্দেশ্য কি ছিল? পাখিটার ডাক কখনই বন্ধ হবে না, নাকি পাখিটি বেশীর ভাগ সময়েই ডাকবে? লোকটি বলল, পাখিটির ডাক কখনোই বন্ধ হবে না- এটা নয়; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল, পাখিটি বেশির ভাগ সময় ধরে ডাকবে। কারণ আমি তো জানি যে, সে খাবে, পান করবে, ঘুমাবে।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, مر فإن امرأتك لك حلال 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই সে তোমার জন্য হালাল'। (বিস্মিত হয়ে) বিক্রেতা বলল, কিভাবে এটা সম্ভব যেখানে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বিপরীত ফৎওয়া দিয়েছেন! তখন আমি বললাম, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁকে বলবে, আপনার মজলিসে একজন ব্যক্তি বলেছে আমার স্ত্রী হালাল। তারপর আমার দিকে ইঙ্গিত করবে।

লোকটি ফিরে গেলে ইমাম মালেক (রহঃ) বিক্রেতাকে বললেন, এ ব্যাপারে আমি তো তোমাকে ফৎওয়া দিয়েছি! বিক্রেতা বলল, আপনার মজলিসের একজন ব্যক্তি বলেছেন, আমার স্ত্রী হালাল। আমার মজলিসের কেউ বলেছে! লোকটি তখন আমার দিকে ইঙ্গিত করলে ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, তুমি এটা কেমন ফৎওয়া দিলে?

আমি বললাম, আমি তো আপনার নিকটে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে ফাতেমা বিনতু কায়েস (রাঃ) সম্পর্কে একটি হাদীছ শুনেছি। সে হাদীছের আলোকেই আমি এই ফৎওয়া দিয়েছি। যেখানে এসেছে ফাতেমা তার স্বামী আবূ আমর ইবনু হাফস (রাঃ) কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। সে ইদ্দত পালন শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে জানাল আমাকে মু'আবিয়া ও আবু জাহম বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতিমা বিনতে কায়স (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ 'আবু জাহম তো তার কাঁধ থেকে লাঠিই নামায় না। মু'আবিয়া সে তো অভাবী। তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ করো'।[১]

হাদীছটি শুনে ইমাম মালেক বললেন, তাতে কী হয়েছে? এতে তোমার ফৎওয়ার প্রমাণ কোথায়? তখন আমি বললাম, 'আবু জাহম তাঁর কাঁধ থেকে লাঠি নামান না'- এ কথার অর্থ বেশির ভাগ সময় তিনি সফর করে। তিনি অবশ্যই এর মাঝে কোথাও না কোথাও ঘুম ও বিশ্রাম নিতেন। কাজেই যেহেতু তাঁর বেশীর ভাগ সময় সফরেই অতিবাহিত হয়, তাই বলা হয়েছে যে, তিনি লাঠিই নামান না। আর আরবদের মধ্যে এ ধরনের কথার ব্যবহার বহুলভাবে প্রচলিত।

সুতরাং পাখিটি যদি দিনের বেশির ভাগ সময়ে ডাক দিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, পাখিটি সব সময়ই ডাকে। এ কথা শোনে ইমাম মালেক (রহঃ) আশ্চর্যান্বিত হ'লেন এবং মুচকি হেসে বললেন, القول قولك 'তোমার কথাই সঠিক'। মুসলিম ইবনু খালিদ আয-যানজী (রহঃ) আমার দুই কাঁধের মাঝখানে হাত রেখে বললেন, أفت فقد آن لك أن تفتي 'তুমি ফৎওয়া দাও। তোমার ফৎওয়া দেওয়ার সময় হয়েছে'।[২] এ সময় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর বয়স ছিল ১৪ বছর আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বয়স ছিল ৭১।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. কোন বিষয়ে ফৎওয়া দেয়ার পর পরবর্তীতে তা ভুল প্রমাণ হ'লে বা তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কোন ফৎওয়া পাওয়া গেলে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। এতে কোন প্রকার গোঁড়ামি করা যাবে না। এটাই সালাফদের নীতি।

২. ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কেবল বয়স ও অভিজ্ঞতা শর্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা যে কারোর মধ্যে যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ইলহাম করতে পারেন।

৩. একজন মানুষ তার পসন্দমত একাধিক বিদ্বানের নিকটে ফৎওয়া নিয়ে আমল করতে পারেন। নির্দিষ্ট ইমামের সব মাসআলা অনুসরণ করতে হবে বলে যে ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে, উপরোক্ত ঘটনাটি তার অসারতা প্রমাণ করে।

৪. বিদ্বানদের মধ্যে হাদীছের ব্যাখ্যাগত বা বুঝগত মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

---

১. *মুসলিম হা/১৪৮০।*
২. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৫১/৩০৪; সালাহুদ্দীন খলীল ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত ২/১২২।*

www.at-tahreek.com

কা'বাগৃহের নীচে কবরস্থান! সংশয় নিরসন

*-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা : পৃথিবীর সকল কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপযুক্ত আবাসভূমি দুনিয়া। আর দুনিয়ার মধ্যে কতিপয় স্থানকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে পবিত্র কা'বা গৃহের অবস্থান সবার শীর্ষে। যাকে আল্লাহ মুক্বীম, মুসাফির, ত্বাওয়াফকারী ও ই'তেকাফকারীদের জন্য সর্বদা পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*। পবিত্র কা'বা গৃহ সারা বিশ্বের সকল মুসলিমের মিলনকেন্দ্র। যেখানে প্রতিদিন হাযার হাযার মুসলিম জমায়েত হয়ে ওমরাহ, ছালাত, ত্বাওয়াফ সহ বিভিন্ন ইবাদত করে থাকেন। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয় তার সাথে ঝুলন্ত থাকে। কখন সেখানে গিয়ে হজ্জ-ওমরাহ কিংবা ছালাত আদায় করতে পারবেন সেই ব্যাকুলতা নিয়েই তারা দিনাতিপাত করেন। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা পবিত্র কা'বা গৃহকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে না তা কি হয়? আর তাইতো তারা পবিত্র কা'বার নীচে ৯৯ জন নবীর কবর আছে মর্মে কিছু জাল বর্ণনা বানিয়ে মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। যাতে করে মুসলমানদের হৃদয়ে পবিত্র কা'বা গৃহ সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আর কিছু সরল মুসলিম জাল হাদীছগুলোর কোন প্রকার তাহক্বীক্ব না করে জনসমাজে প্রচার করে চলেছে। কিছু আলেমের এহেন অজ্ঞতার ফলে সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে খটকার সৃষ্টি হয় যে, আমরা কি তাহ'লে কবরস্থান তাওয়াফ করছি? বা কবরস্থানে ছালাত আদায় করছি? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে তাওয়াফ ও ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করা হ'ল।-

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের হুকুম :

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা ইহূদী-খৃষ্টানদের বৈশিষ্ট্য। কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন। এমনকি তাদেরকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল, সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا 'ইহূদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে আশঙ্কা না থাকলে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হ'ত। কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে, (উন্মুক্ত রাখা হ'লে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।[১]

অপর একটি হাদীছে এসেছে. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যেসব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ– 'এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তাদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত। আর তাতে ঐসব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করত। এরা আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্ট'।[২]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি যে, أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. 'সাবধান! তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করত। সাবধান তোমরা কবরসমূহকে মসজিদ বা সিজদার স্থান বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[৩]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন'।[৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ মারসাদ আল-গানবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا، 'তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে ছালাতও আদায় করবে না'।[৫]

সম্মানিত পাঠক! উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, কবরকে মসজিদ বানানো কিংবা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করা হারাম। যেখানে কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরীর উপর এত কঠোরতা, সেখানে পবিত্র কা'বা গৃহের ন্যায় পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ কবরস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কথা কি কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে?

সম্মানিত পাঠক! নদীতে জাল নিক্ষেপ করলে জালে আটকে পড়া সবকিছুই যেমন গ্রহণ করা যায় না, সাপ ব্যাঙ ফেলে

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *বুখারী হা/১৩৩০।*

২. *বুখারী হা/৪৩৪; মুসলিম হা/৫২৮।*
৩. *মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩।*
৪. *মুসলিম হা/৯৭০।*
৫. *মুসলিম হা/৯৭২; তিরমিযী হা/১০৫০; মিশকাত হা/১৬৯৮।*

দিয়ে শুধু মাছ গ্রহণ করতে হয়; তেমনি কোন কিতাবে কোন কিছু পেলেই তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তার মান যাচাই করতে হয়। যঈফ, মুনকার, মাওযূ বা জাল হাদীছ ফেলে দিয়ে কেবল ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করতে হয়। পবিত্র কা'বা গৃহের নীচে ৯৯ জন নবীর কবর রয়েছে মর্মে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। মূলতঃ তা হাদীছ নয়, বরং আছার। যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। আছারটি নিম্নরূপ-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا هَلَكَتْ أُمَّتُهُ لَحِقَ بِمَكَّةَ فَيَتَعَبَّدُ فِيهَا النَّبِيُّ، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ، فَمَاتَ بِهَا نُوحٌ، وَهُودٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ، وَقُبُورُهُمْ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْحَجَرِ-

'মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবীগণের উম্মত যখন (নবীদের কথা না মানার কারণে) ধ্বংস হয়, তখন নবীগণ মক্কায় অবস্থান নেন। সেখানে মৃত্যু পর্যন্ত নবী ও তাঁর সাথীরা ইবাদত করতে থাকেন। এর সূত্র ধরে সেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), ছালেহ (আঃ) এবং শু'আইব (আঃ)। আর তাঁদের কবর সমূহ যমযম ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে রয়েছে।[৬]

প্রথমতঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিকে হাদীছ মনে হ'লেও তা হাদীছ নয়, বরং এটি আছার। কেননা রাবী মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন তাবেঈ। দ্বিতীয়তঃ আছারটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যার কারণে তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ সাঈদ দিমাশক্বী (রহঃ) বলেন, هذا الأثر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل ، فمحمد بن سابط ليس من الصحابة، وقد نظرت في الإصابة لابن حجر فلم أجده ذكره 'এই আছারটি রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত নয়। কেননা তা মুরসাল। মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ছাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত নন। আমি ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রণীত আল-ইছাবাহ গ্রন্থ দেখেছি। কিন্তু সেখানে তার নাম পাইনি।[৭] ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রহঃ) বলেন, لا يحتج به 'আছারটি দলীলযোগ্য নয়'।[৮] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

روى ابن جرير والأزرقي عن عبدالرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.

'ইবনু জারীর এবং আযরাক্বী (রহঃ) আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত (রহঃ) অথবা অন্যান্য তাবেঈদের থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নূহ (আঃ)-এর কবর মসজিদুল হারামে রয়েছে। এটি মুরসাল যঈফ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত।[৯] আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ সাঈদ দিমাশক্বী (রহঃ) বলেন,

هذا الأثر ليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فراويه تابعي، ومثل هذا الخبر لايقال بالرأي، بل لابد فيه من دليل صحيح من الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فلا يحتج به، فلا يحتج إلا بما ثبت عن رسول الله، وهذا ليس قولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قول تابعي، وديننا لانأخذه إلا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام .

'এই আছারটি নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেনি। বরং এর বর্ণনাকারী একজন তাবেঈ। আর এমন সংবাদের ব্যাপারে মস্তিষ্ক প্রসূত কিছু বলা যায় না। বরং এর জন্য কুরআন ও সুন্নাতের ছহীহ দলীল আবশ্যক। যদি বর্ণনাটি এমন (কুরআন ও সুন্নাতের ছহীহ দলীল বিহীন) হয় তাহ'লে তা দলীল হিসাবে গৃহীত হবে না। সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত না হ'লে দলীল হিসাবে গৃহীত হবে না। আর এটা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নয়; বরং একজন তাবেঈর কথা। আমরা আমাদের দ্বীন রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করব না।[১০] এছাড়াও এ মর্মে আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়; যার সবগুলোই যঈফ কিংবা জাল। তাই এগুলোকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[১১]

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কা'বা গৃহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ। যার ভিত্তি স্থাপন করেন ফেরেশতামণ্ডলী। এরপর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অনেক বার সংস্কার করা হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ 'নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা অবশ্যই মক্কায়। যা বরকতমণ্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ নিদর্শক' *(আলে-ইমরান ৩/৯৬)*। তাই বিষয়টি যদি এমনই হয় যে, পবিত্র কা'বা সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ; যার অস্তিত্ব প্রথিবীর শুরু থেকেই। তাহ'লে কা'বার নিচে কখন ও কিভাবে কবর আসল? এর জবাব কি দেওয়া সম্ভব? অতএব আসুন! কোন গ্রন্থে কিছু পেলে তা যথাযথভাবে তাহক্বীক্ব না করে গ্রহণ ও প্রচার করা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!!

---

৬. *আখবারে মক্কা, আযরাক্বী পৃঃ ২/১২৫; তাফসীরে কুরতুবী পৃঃ ২/১৩০।*
৭. *আহাদীছ ইয়ুহতাজ্জু বিহাশ শী'আ, আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ সাঈদ দিমাশক্বী (রহঃ), ১/৪৩৩।*
৮. *তদেব।*
৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ পৃঃ ১/১৩৭; ক্বাছাছুল আম্বিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৯ পৃঃ।*
১০. *আহাদীছ ইয়ুহতাজ্জু বিহাশ শীআ, ১/৪৩৩।*
১১. *বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৩।*

ক্যাপসিকাম চাষ করবেন যেভাবে

ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ একটি জনপ্রিয় সবজি। ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ এবং সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এতে ফাইবার, আয়রন এবং অন্যান্য খনিজ উচ্চ পরিমাণে রয়েছে। এতে ক্যালরির পরিমাণ সামান্য। ক্যাপসিকামের আকার-আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তবে সাধারণত ফল গোলাকার ও ত্বক পুরু হয়। এটি আমাদের দেশের প্রচলিত সবজি না হ'লেও সম্প্রতি এর চাষ প্রসারিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে টমেটোর পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সবজি হচ্ছে মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকাম। এটি অভিজাত হোটেল ও বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে বিক্রি হয়ে থাকে। এছাড়া ক্যাপসিকাম বিদেশে রফতানীর সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর।

প্রতি বিঘায় ক্যাপসিকামের ফলন প্রায় সাড়ে ৩ হাযার কেজি পর্যন্ত হ'তে পারে। সবুজ ক্যাপসিকাম প্রতি কেজির বাজার মূল্য ১৫০ টাকা। আর লাল ও হলুদ রঙের ক্যাপসিকাম কেজি ৩৫০ টাকা দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া ক্যাপসিকাম চাষীদের প্রতি বিঘায় খরচ হয় প্রায় ৫৫ হাযার টাকা। আর প্রতি বিঘার ফলন বিক্রি হয় প্রায় দেড় লাখ টাকায়। ক্যাপসিকাম চাষে কৃষকের লাভ দ্বিগুণের চেয়েও বেশী থাকে।

ক্যাপসিকাম চাষ পদ্ধতি :

বীজ বপণের উপযুক্ত সময় অক্টোবর-নভেম্বর মাস। তবে বর্তমানে ঘরোয়া কৃষকরা ১২ মাসই এটি চাষের চেষ্টা করছেন। ক্যাপসিকাম চাষ করার জন্য বাজার থেকে কেনা ক্যাপসিকাম থেকেই বীজ সংগ্রহ করা যায়। আবার বাজারে বীজ কিনতেও পাওয়া যায়। ক্যাপসিকাম থেকে বীজ সংগ্রহ করতে চাইলে পরিপক্ক ক্যাপসিকাম থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে একটি পাত্র পূর্ণ করে বীজগুলি বপন করতে হবে। যে কোন পাত্রে এই উদ্ভিদ লাগানো যায়, তবে গভীরতা কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি হ'তে হবে। উদ্ভিদ লাগানোর পরে, আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পানি দিন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এর থেকে বীজ অঙ্কুরিত হবে।

আর বীজ দিয়ে চাষ করতে চাইলে বীজ থেকে প্রথমে চারা তৈরি করে নিতে হয়। প্রতি শতকের জন্য ১ গ্রাম বীজ দরকার হয়। বীজগুলোকে ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে আগে থেকে তৈরি করে রাখা বীজতলায় ১০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাইন করে বীজ বুনতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হ'লে ৯-১২ সে.মি. আকারের পলি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোস্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।

গাছের পরিচর্যা :

অঙ্কুরোদগমের আগে গাছটিকে কম সূর্যালোকে রাখতে হবে। এই সময়ে সেটিকে বাড়ির ভিতরে রাখা যায়। অঙ্কুরোদগম হওয়ার পরে টবটিকে বারান্দায় সূর্যালোকে রাখা যায়।

তবে এই গাছটি যেন প্রখর সূর্যের আলো না পায়, সেদিকে নযর রাখতে হবে। যে টবে বা পাত্রে এই গাছটি রোপণ করা হবে, তার মাটিতে যেন ভাল পরিমাণে আর্দ্রতা বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা পড়ন্ত বিকেলে রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। ক্যাপসিকামের গাছ বৃদ্ধি পেতে প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে।

আর জমিতে চাষ করলে মনে রাখতে হবে মিষ্টি মরিচ খরা ও জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারে না। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সে.মি. হ'তে হবে এবং লম্বায় দু'টি সারিতে ২০টি চারা সংকোলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে। দু'টি সারির মাঝখানে ৩০ সে.মি. ড্রেন করতে হবে। জমিতে প্রয়োজন মতো সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে। আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানি দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ :

ক্যাপসিকামে কোনও রোগ বা পোকার আক্রমণ হ'লে টক্সিন মুক্ত দ্রবণ ব্যবহার করাই শ্রেয়। এক চামচ সাবান গুঁড়া এবং নিম তেল এক টেবিল চামচ নিন, উভয় এক লিটার পানিতে মিশ্রিত করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে এই দ্রবণ একবার স্প্রে করতে হবে।

সার ব্যবহার :

সারের জন্য শাক-সবজি এবং ফলের খোসা পচা পানি, পাতা পচা ইত্যাদি মাটিতে প্রয়োগ করা যায়। এগুলি মাটির গুণমানকে উন্নত করে এবং উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে।

আর যদি জমিতে চাষ করা হয় তাহ'লে মিষ্টি মরিচ চাষে প্রতি শতাংশে গোবর ৪০ কেজি, ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ১.৪ কেজি, এমপি ১ কেজি, জিপসাম ৪৫০ গ্রাম এবং জিংক অক্সাইড ২০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক গোবর, টিএসপি, জিংক অক্সাইড, জিপসাম, ১/৩ ভাগ এমপি এবং ১/৩ ভাগ ইউরিয়া চারা রোপণের গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ২/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর যথাক্রমে ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ :

মিষ্টি মরিচ সাধারণত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হওয়ার আগেই মাঠ থেকে উঠানো যায়। সাধারণত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ গাছে একবারে প্রায় ৪ থেকে ৫টি ক্যাপসিকাম আসে। একবার গাছ ভালো করে বিকশিত হয়ে গেলে প্রথম যখন ফল আসবে তখন তা সংগ্রহ না করাই ভালো। এতে গাছ দৃঢ় হয়। দ্বিতীয়বার থেকে ফল সংগ্রহ করবে। ফল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমাণে বোটা রেখে দিবে। ফল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা অথচ ছায়াযুক্ত স্থানে বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
অচিনতলা, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন সিদ্ধান্ত নিল শেষে
দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় গড়বে বাংলাদেশে।
কোথায় পাবে এত টাকা কোথায় পাবে জমি?
অবকাঠামো গড়বে সেথায় ইজতেমার নিজ ভূমি।
এ'লান হ'ল সবার কাছে, দাও গো জমি-টাকা
জমি কিনে গড়তে হবে দালান-কোঠা পাকা।
বিশ্ববিদ্যালয় হবে এবার তোমার দানের টাকায়
ছাদাক্বায়ে জারিয়া হোক, পড় না কেউ ফাঁকায়।
ছহীহ আক্বীদায় চলবে শিক্ষা শিরক-বিদ'আত মুক্ত
সমাজ সংস্কার করতে হবে, গড়বে আলেম শক্ত।
বাংলার যমীন হবেই একদিন শুদ্ধ আক্বীদায় ভরা
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এসো করতে হবে ত্বরা।
আল্লাহ্র কাছে দু'হাত তুলে জানাই ফরিয়াদ
বাস্তবায়ন হয়গো যেন শেষ জীবনের সাধ।

টাকা

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

দুই অক্ষরে শব্দ একটি নাম হ'ল তার টাকা
ঐ টাকা কামাইয়ে অনেকেই আখেরাতকে করে ফাঁকা
লুটোপুটি খায় অনেকে হালাল হারাম নাই
যে পথেই আসুক তা দেখবো না হাতে যদি পাই।
খুন করে ভাই কতজনকে করতে কামাই টাকা
যেভাবেই হোক প্রকাশ পায় তা থাকে না কভু ঢাকা।
অনেক বড় ধনী হব এই আশাতে দেশের সম্পদ দিয়ে
অট্টালিকা আর মিল-ফ্যাক্টরী গড়ে বিদেশেতে গিয়ে।
টাকা দিয়ে যায় না রাখা নিজের ক্ষমতা ও মান
আল্লাহ্র হুকুমে যেদিন নিবে সবার জান।
সূদ ঘুষ আর জুয়া বাটপারি বাদ দেইনি কিছু
হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ফিরে দেখেনি পিছু।
হারাম পথে টাকা কামাই করে যদি অনেক বড় ধনী হই
অতীতে যত টাকার কুমির ছিল তারা আজ পৃথিবীতে কই?
টাকা কামাইয়ের হিসাব দিতে হবে কঠিন হাশরের দিন
সৎ পথে টাকা কামাইয়ের জন্য কঠিন শপথ নিন।

সূদ-ঘুষ

-মুহাম্মাদ জাবেদ আলী সরকার
সাং ভাড়াহার, বগুড়া।

কুরআন বলে সূদ খাবে না
ঘুষ নিবে না হাতে।
ছালাত-ছিয়াম, কাল, পরকাল,
নষ্ট হবে হাতে ॥
তবু মানুষ ভয় করে না
সূদের টাকা খায়।
ঘুষের টাকা কেউ ছাড়ে না
যে যতটা পায়॥
জ্ঞানপাপী মানুষ এরা
মূর্খ কেউ নয়।
কর্ম তাদের ধর্ম ছাড়া
পশুর পরিচয়॥
এসব বড় লজ্জার কথা
মরণ অনেক ভালো।
কে বলে, ভাই তাদের মধ্যে
আছে শিক্ষার আলো॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুবাশ্বিরুল ইসলাম সা'দ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বাতিলের গাঢ় অমানিশার চিরে বুক
এই ধরাতে আজ অহি-র আলো জেগে উঠুক।
অহি-র তেজোদীপ্ত আলোয় জীবন মোদের উদ্ভাসিত
যত সব বাতিল বিধান হোক আজ ভূলুণ্ঠিত।
অহি ব্যতিরেকে করি বাতিল সকল বিধান,
এই ধরাতে উড়াই আবার তাওহীদী নিশান।
বাতিল দূরীকরণে অহি-র বার্তা জানি,
বিপথে ছুটন্ত সমাজে অহি-র মশাল আনি।
আজ মুক্তির একই পথ মোরা ধরি,
দাওয়াত ও জিহাদের সৈনিক হয়ে লড়ি।
হাজারো বাধাতেও হক্বের পথে অটল থাকি,
ইসলামের ওপর বিজাতীয় সভ্যতা রুখি।
ন্যায় ও ইনছাফের দণ্ড হাতে সমাজে দাঁড়াই
সমাজ, দেশ ও জাতির সেবায় জীবন কাঁটাই।
কে যেন দূর গগণ হ'তে আমাকে সেই পথে ডাকে,
এসো সবে ন্যায় ইনছাফ হকের পথে এসো
সে কেউ না! সে তো আহলেহাদীছ আন্দোলন!

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

স্বদেশ

উদ্বোধন হ'ল পদ্মা সেতু : ঢাকার সাথে সড়কপথে যুক্ত হ'ল দেশের এক-তৃতীয়াংশ

সব বাধা পেরিয়ে ইতিহাসের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। গত ২৫শে জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার সাথে সড়কপথে ২১টি যেলার সংযোগস্থাপনকারী ৬.১৫ মূল সেতু ও সেতু সংলগ্ন দু'পাশের সংযোগ সড়ক সহ ৯.৮৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এই সেতুর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের আগে মাওয়া প্রান্তে এক সুধী সমাবেশে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রমত্তা পদ্মার বুকে আজ বহু কাঙ্ক্ষিত সেতু দাঁড়িয়ে আছে। এই সেতু শুধু ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহার কংক্রিটের একটি অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক। এ সময় তিনি সেতু নির্মাণের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের বিশেষভাবে স্মরণ করেন, যারা এই সেতুর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন। তিনি বলেন, এই সেতুর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পদ্মা সেতুর ওপারে কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে উঠবে। জাতীয়ভাবে অন্তত ১ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি বাড়বে। আর ওপারের ২১ যেলার ক্ষেত্রে জিডিপি বাড়বে অন্তত ২ দশমিক ৩ শতাংশ। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। এছাড়া এই সেতুর মাধ্যমে ভারত, ভূটান ও নেপাল সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।

পদ্মা সেতুর পরিচয় : দ্বিতল সেতুটির উপরিভাগে ৪ লেন বিশিষ্ট গাড়ি চলাচলের রাস্তা। তবে এটি আসলে দু'পাশে দু'টি ব্রেকডাউন লেন সহ ৬ লেনের রাস্তা। যার প্রস্থ ১৮.১০ মি.। সেতুর নীচ তলায় থাকবে মিটার গেজ সহ ব্রড গেজ রেলপথ। যেখান থেকে নদীর পানির দূরত্ব থাকবে অন্তত ১৮ মিটারের। পানির স্তর বাড়লেও ব্রীজের তলা দিলে ৫ তলা বিশিষ্ট জাহাযের যাতায়াতে অসুবিধা হবে না। এই সেতুতে রয়েছে ৪১টি পিলার। যার ভীত পানির নীচে ১২০ মিটার গভীরে নেমে গেছে। এতে রয়েছে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যা রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পেও অনায়াসে টিকে যাবে। রেল সেতু ২০২৩ সালের ২৫শে জুন উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর উত্তর অংশ মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় এবং দক্ষিণ অংশ থাকবে শরীয়তপুরের জাজিরায়।

যে পথ ধরে আজকের পদ্মা সেতু :

ঢাকা থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলকে বিভক্ত করা পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে একটি সেতু তৈরীর পরিকল্পনা কখন শুরু হয়, এ প্রসঙ্গে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'র সদস্য বুয়েটের এমেরিটাস প্রফেসর আইনুন নিশাত বলেন, পদ্মা সেতুর প্রাক্-সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়েছিল আশির দশকে যমুনা সেতুর সঙ্গেই' *(প্রথম আলো ২৫শে জুন ২০২২)*। পরে শেখ হাসিনার আমলে ১৯৯৯ সালের মে মাসে সেতু প্রকল্পের জন্য প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়। এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ কেন দরকার, কী সুবিধা হবে, নির্মাণ ব্যয় কেমন হ'তে পারে ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে দেখা হয়। অতঃপর ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অতঃপর একই বছর ১০ই অক্টোবর বিএনপি ক্ষমতায় এলে কাজ থেমে যায়। এরপর ২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে ২৮শে আগস্ট ১০ হাযার ১৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে মূল পদ্মা সেতু প্রকল্প পাস করা হয়। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা পূর্বের নকশা পরিবর্তন করে সেতুর সাথে রেল, গ্যাস, পানি, নদী শাসন ও অ্যাপ্রোচ সড়ক সহ 'পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প' গ্রহণ করেন এবং একে অগ্রাধিকার তালিকায় নিয়ে আসেন। অতঃপর ১৯শে জুন সেতুর নকশা প্রণয়নের প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। যেখানে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময় নির্ধারণ করা হয়।

সেতু বাস্তবায়নে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সেতুর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকর্তা, নকশা পরামর্শক ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করে। ২০২০ সালের ২৮শে এপ্রিল রেজা চৌধুরীর মৃত্যুর পর এই কমিটির প্রধান হন বিশিষ্ট অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ প্রফেসর শামীম জেড বসুনিয়া। এই কমিটিতে আরও আছেন নদী বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের এমিরেটাস প্রফেসর আইনুন নিশাত, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ ও পাইলিং বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হোসাইন মুহাম্মাদ শাহীন প্রমুখ।

বাধা-বিপত্তি : শুরুতে ২০১১ সালের ২৮শে এপ্রিল বিশ্ব ব্যাংকের সাথে ১২০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই বছরে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, আইডিবি ও এডিবি এই সেতুর অর্থায়নে যুক্ত হয়। কিন্তু ২০০৮-০৯ সালে প্রকল্প প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কিছু লোকের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় বিশ্বব্যাংক অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেয়। অতঃপর ২০১২ সালের ২৯শে জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে তারা ঋণচুক্তি বাতিল করে। তখন অন্যান্য দাতারাও সেটির অনুসরণ করে। এ সময় প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী সরকারকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমরা যমুনা সেতু করেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং দিকটা বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ প্যানেল সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারবে। আপনারা অর্থের দিকটা দেখুন' *(প্রথম আলো ২৪শে জুন ৮ম পৃ.)*।

উপরোক্ত ঘটনায় তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ও সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াকে জেলে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় কানাডীয় আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। তখন বিশ্বব্যাংক পুনরায় অর্থায়নে ফিরে আসতে চাইলেও সরকার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজস্ব অর্থায়নে করার সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনৈতিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদে থাকতে না পেরে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. ইউনুস পদ্মা সেতু নিয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে চক্রান্তের আশ্রয় নেন। এমনকি তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে দিয়ে শেখ হাসিনাকে ফোনও করান। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল সহ অনেকে নানা নেতিবাচক মন্তব্য করেন। ২০১৯ সালে পদ্মা সেতুর জন্য শিশুদের 'কাটা মাথা' লাগবে বলে গুজব ছড়ানো হয়। এ নিয়ে নেত্রকোনার একটি ঘটনা পত্রিকায় আসে। ফলে বরগুনা সহ পুরা দক্ষিণাঞ্চলে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সেতুর শুরু ও শেষ :

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় পদ্মা সেতু। এরপর একে একে ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ সেতুটি পুরোপুরি দৃশ্যমান হয় ২০২০ সালের ১০ই ডিসেম্বর।

সেতুর তত্ত্বাবধানে ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বুয়েট এবং কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে করপোরেশন (কেইসি)। মূল সেতু নির্মাণের

জন্য কাজ করেছে চীনের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী (এমবিইসি)। আর নদীশাসনের কাজ করেছে দেশটির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন। দু'টি সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ করেছে বাংলাদেশের আবদুল মোনেম লিমিটেড। এ প্রকল্পে কাজ করেছেন ৩ হাযার নির্মাণ শ্রমিক সহ প্রায় ৪ হাযার শ্রমিক।

নির্মাণ ব্যয় :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৩০ হাযার কোটি টাকারও বেশী। তবে মূল সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১২ হাযার ১০০ কোটি টাকা। নদী শাসনে ব্যয় হয়েছে ৯ হাযার ৪০০ কোটি টাকা। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনে ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ হাযার কোটি টাকা। এখানে ৮০ হাযারের বেশী লোককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারও কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সেতুর পাশ দিয়ে ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ লাইন বসাতে খরচ ১ হাযার কোটি টাকা। মূল সেতুর রেললাইনের পাশ দিয়ে গ্যাস লাইন নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্সির জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। এছাড়া পদ্মা সেতুকে দুই অংশের মূল সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে নির্মিত হয়েছে মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে প্রায় ২৭ কি.মি. সংযোগ সড়ক। যা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড় হাযার কোটি টাকা।

রেল পথ চালু হবে কবে?

পদ্মা সেতুতে রেল পথ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ট্রেন চলাচল শুরু হবে ২০২৩ সালের ২৫শে জুন তারিখে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে রেলপথ যাবে যশোরে। এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৬৯ কি.মি.। এর মধ্যে ২৩ কি.মি. হবে পুরোপুরি এলিভেটেড (উড়াল)। যশোর পর্যন্ত রেলপথের কোথাও থাকবে না কোন লেভেল ক্রসিং। এতে সময় বাঁচবে, ঘটবে না দুর্ঘটনা। দেশে উড়াল ও ক্রসিংবিহীন প্রথম রেলপথ হ'তে চলেছে এটি।

ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপযেলা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার রেলপথ ২০২৩ সালের জুন মাসে খুলে দিতে কাজ চলছে। ২০২৪ সালে পুরো কাজ শেষ হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ৪০ হাযার ৪২৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে চীন ঋণ দিবে ২১ হাযার কোটি টাকা এবং বাকী অর্থ দেবে সরকার।

স্থাপত্যশৈলীর যেসব অনন্য রেকর্ডের অধিকারী পদ্মা সেতু

খরস্রোতা পদ্মার বুক চিরে দাঁড়ানো পদ্মা সেতু কেবল নদীর দুই পাড়কেই এক করেনি, স্থাপত্যশৈলীতেও অনন্য নযীর স্থাপন করেছে। ভার বহন ক্ষমতা, দুর্যোগ সহনশীলতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিক দিয়ে পদ্মা সেতু একের পর এক রেকর্ডে পেছনে ফেলেছে বিশ্বের বড় বড় সেতুকে। এর তলদেশে রয়েছে ৪২ তলা ভবন সমান কাঠামো, যা বিশ্বে প্রথম।

সেতু সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানান, খরস্রোতা পদ্মায় প্রতি সেকেণ্ডে ১ লাখ ৪০ হাযার ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হয়। এমন দ্রুত গতির পানিপ্রবাহ কেবল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতেই আছে। এ কারণে পদ্মায় সেতু নির্মাণ ছিল অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিস্ময়কর। পদ্মার তলদেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল, যে কোন মুহূর্তে গভীর স্রোতে এবং ভূমিকম্প হ'লে ২১০ ফুট তথা ২১ তলা ভবন সমান গভীর খাদ তৈরী হ'তে পারে। ফলে ধসে পড়তে পারে সেতু। এ চ্যালেঞ্জ জয় করেই পদ্মার ওপর দাঁড়িয়েছে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল সেতু। পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের চেয়ারম্যান, বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অবকাঠামো প্রকৌশলী অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া বলেন, পদ্মা সেতু নির্মাণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতের চেষ্টা আর কারিগরি চ্যালেঞ্জ সামলাতে গিয়ে বিশ্বের সামনে বেশকিছু নযীর স্থাপন করেছে বাংলাদেশ।

পাইলিং : সেতুকে টেকসই করতে নদীর অংশের খুঁটির নিচে চীন থেকে আনা তিন মিটার ব্যাসার্ধের ১২২ মিটার গভীর পর্যন্ত ইস্পাতের পাইল বসানো হয়েছে, যা ৪০ তলা ভবনের সমান। বিশ্বে এত গভীরে ও মোটা পাইল কোন সেতুতে বসানো হয়নি। প্রতিটি পিলারে বসেছে ৬টি পাইল। পাইলের মাথায় মাটি নরম থাকায় ২২টি পিয়ারে পাইল দেওয়া হয়েছে ৭টি করে। কিছু জায়গায় সবচেয়ে বেশী দৈর্ঘ্যের পাইল দিয়েও মাটির নিচে শক্ত স্ত র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্কিন গ্রাউটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে বসানো হয় এসব পাইল, যে প্রযুক্তি বিশ্বের কোথাও প্রয়োগ হয়নি, এমনকি কোন পাঠ্যবইয়েও নেই।

কংক্রিট ও স্টিল : পৃথিবীতে এই প্রথম কোন সেতু নির্মাণে কংক্রিট এবং স্টিল উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে, যা সেতুকে করে তুলেছে কয়েক গুণ শক্তিশালী। বিশ্বের অন্যান্য সেতুগুলো হয় কংক্রিটে নির্মিত, না হয় স্টিলে।

সবচেয়ে বড় বিয়ারিং : ভূমিকম্প প্রতিরোধে পদ্মা সেতুতে ব্যবহার করা হয়েছে সবচেয়ে বড় ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং। একেকটি বিয়ারিংয়ের ওযন ধারণক্ষমতা ১০ হাযার ৫০০ মেট্রিক টন। এর আগে পৃথিবীতে কোন সেতুতে এমন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়নি। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে টিকে থাকার মতো সক্ষমতা রয়েছে এ সেতুর। বিয়ারিংগুলো চীনের চৌহানে ভূমিকম্প পরীক্ষার পর ফের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

সেতু রক্ষায় নদীশাসন : পদ্মার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এজন্য যে, ১০০ বছরে নদীর পাড় ভাঙতে ভাঙতে যদি নদীটাই সেতুর বাইরে চলে যায়, তাহ'লে তো সেতুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেকারণ সেতুর দুই পাশে নদীর তীর এমন মযবুত করা হয়েছে, যেন সহজে তীর না ভাঙে। একেই বলা হয় নদীশাসন। এজন্য সেতুর দুই পাশে নদীর ঢালে ১৪ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী একেকটি ৮০০ কেজি ওযনের প্রায় ২ কোটি ১৭ লাখ জিও ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে। পাথর ফেলা হয়েছে প্রায় সোয়া ১০ লাখ ঘনমিটার। নদীর তলদেশে ঢাল তৈরির জন্য ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে আনা একেকটি ১ টন ওযনের পাথর। সবমিলিয়ে নদী শাসনে ব্যয় হয়েছে ৯ হাযার ৪০০ কোটি টাকা, যা এ কাজে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল। এছাড়া সেতুর জন্য ১৪ কিলোমিটার নদীশাসন আর কোথাও নেই। এত গভীরে নদীশাসনও কোথাও হয়নি।

সর্ববৃহৎ ক্রেন : পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে, যার ওযন ৪ হাযার টন। বিশ্বে প্রথম কোন সেতু তৈরিতে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রেনটি চীন দেশ থেকে ভাড়ায় আনা হয়েছে। ক্রেনটির দাম আড়াই হাযার কোটি টাকা।

সবচেয়ে বড় হ্যামার : এই সেতুতে সাড়ে ৩ হাযার টন ওযনের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্যামার ব্যবহার হয়েছে।

অধ্যাপক শামীম জেড বসুনিয়া বলেন, এক বছরে ২৫-৩০ ফুট পলি জমে পদ্মায়। সে কারণে নৌযান চলতে পানি থেকে ৭০ ফুট উঁচুতে সেতু করা হয়েছে। সেতুতে ব্যবহার করা কংক্রিটের অধিকাংশই আনা হয়েছে ভারত, ভুটান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। বিশেষ কিছু রড আনা হয়েছে চীন থেকে। সংযুক্ত আরব

আমিরাত ও যুক্তরাজ্য থেকে অ্যালুমিনিয়াম আনা হয়েছে।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক দেওয়ান মোহাম্মদ আব্দুল কাদের বলেন, পদ্মার নীচের মাটি খুবই নরম। তাছাড়া খরস্রোতা নদী হওয়ায় নীচের মাটি সরে যায় প্রতিনিয়ত। এ অবস্থায় কীভাবে এত বড় একটা অবকাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে, তা ঠিক করা ছিল প্রকৌশলীদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশের সাধারণ সিমেন্ট দিয়ে এসব পিলারের গ্রাইন্টিং তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানিকৃত মাইক্রো ফাইন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত মিহি এবং শক্তিশালী। এতে বস্তা প্রতি খরচ হয়েছে ১৫ হাযার টাকা।

সবমিলিয়ে এই প্রকল্পে ১০টি দেশের বিপুল উপকরণ এবং প্রায় ৫০টি দেশের কিছু না কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া এর বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশ, চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়া সহ ২০টি দেশের মানুষ সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

মৎস্যশূন্যের পথে বঙ্গোপসাগর

ভয়াবহ মাত্রায় বিষিয়ে উঠছে বঙ্গোপসাগর। মাছসহ সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের টিকে থাকার অনুপযোগী হয়ে উঠছে সমুদ্রের পরিবেশ-প্রকৃতি। কর্ণফুলী নদী ও বঙ্গোপসাগরের মিলিত মোহনায় চট্টগ্রাম বন্দরের নৌ-চলাচল চ্যানেলে ড্রেজিং করতে গিয়ে তলদেশে স্থানভেদে ২ থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত পুরু প্লাস্টিক-পলিথিন ও কঠিন বর্জ্যের স্তর পাওয়া গেছে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের মোটা আস্তর জমেছে বঙ্গোপসাগর-এর উপকূলজুড়ে। তাছাড়া বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা অঞ্চলসহ সারাদেশের হাযারো কল-কারখানার বিপুল পরিমাণ শিল্পবর্জ্য নদী-নালা-খাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে।

তেল বা পোড়া তেলের বর্জ্য, সমগ্র দেশে জমিতে ব্যবহৃত বিষাক্ত কীটনাশক, সারসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক-পলিথিন মিলিয়ে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগর। প্রতিদিনই শত শত জাহায-ট্রলার, নৌযান থেকে বর্জ্য-আবর্জনা সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে অবাধে। যা মানুষের তৈরি সমস্যা-সঙ্কট। অথচ এর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা কার্যত নেই। অভাব রয়েছে বিশেষায়িত সার্ভেল্যান্স জাহায ও প্রশিক্ষিত জনবলের।

সমুদ্রে ওইসব বিষাক্ত বর্জ্য মাছেরা খাদ্যের সাথে খেয়ে ফেলছে। ফলে এসব বর্জ্য উপাদান শেষ গন্তব্য হিসেবে ঢুকছে মানুষের পেটে। এতে করে নানাবিধ জটিল রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চঝুঁকি রয়েছে মানুষের। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রণের অব্যাহত প্রক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের পানিতে অক্সিজেনের অভাব প্রকট হচ্ছে। গভীর সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে 'ডেড জোন'। এর ফলে মাছসহ জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়েছে। মাছশূন্য হতে চলেছে বঙ্গোপসাগর।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস্থর প্রফেসর সমুদ্রবিজ্ঞানী সাইদুর রহমান চৌধুরী জানান, প্লাস্টিক-পলিথিন সমুদ্রের তলদেশে ঢেকে ও জেঁকে বসছে। এতে করে সাগরের তলদেশীয় মাছের বিচরণ এলাকা মাছশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কৃষিকাজে মাত্রাতিরিক্ত হারে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার বিশেষত ইউরিয়া সার, বিষাক্ত কীটনাশকের অর্ধেকই পানিতে ধুয়েমুছে সারাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য নিঃসরণের ফলে বঙ্গোপসাগরের পানিতে অক্সিজেন-শূন্য জোন সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে মাছসহ পরিবেশ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়েছে। প্লাস্টিক-পলিথিন, বিষাক্ত রাসায়নিক জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে।

প্রফেসর সাইদুর জানান, এই রাসায়নিক দূষণের কারণে বঙ্গোপসাগরের বিরাট এলাকা বর্তমানে অক্সিজেন-শূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে মাছ টিতে থাকতে পারবে না। বঙ্গোপসাগরের কমপক্ষে ১০ ভাগ এলাকা অক্সিজেন-শূন্য। তবে এটা ২০১৬ সালের গবেষণার তথ্য। এখন যত এলাকায় ইউরিয়াসহ রাসায়নিকের দূষণ ছড়িয়ে পড়বে, অক্সিজেন-শূন্য এলাকার বিস্তার ও আয়তন ততই বেড়ে যাবে।

বিগত ২০১৮ সালে জাতিসংঘের সহায়তায় নরওয়ের সর্বাধুনিক জরিপ-গবেষণা জাহায 'ড. ফ্রিডজফ নেনসেন-৩'-এর সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ-প্রকৃতির উপর পরিচালিত সর্বশেষ গবেষণা কার্যক্রমে দেশী-বিদেশী ৩০ জন বিজ্ঞানীর অন্যতম ছিলেন প্রফেসর সাইদুর রহমান চৌধুরী। এই গবেষণায়ও সমুদ্রে রাসায়নিক দূষণে অক্সিজেন-শূন্য জোন সৃষ্টির বিষয়টিও উঠে আসে।

বঙ্গোপসাগরের এক লাখ ১৮ হাযার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা। ক্রমাগত ভয়াবহ দূষণ, বেপরোয়া মাছ বিশেষ করে মা-মাছ নিধন, বিদেশী ট্রলার নৌযানে ব্যাপকহারে মাছ চুরি বা লোপাটের কারণে বঙ্গোপসাগরে অসংখ্য প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির মুখে কিংবা অস্তিত্ব সঙ্কটে। সমুদ্রে কয়েকদিনের ট্রিপে মাছ শিকারের জন্য গিয়ে অনেক সময়ই জেলেরা ফিরছে প্রায় খালি হাতে। সমুদ্রপাড়ের অনেক জেলে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

[প্রত্যেক সরকারই এসবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলী আজও দূষণমুক্ত ও অবৈধ দখলদার মুক্ত হয়নি। এর উত্তর সবাই জানেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? যারা শপথ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তারা শপথ ভঙ্গের প্রতিযোগিতায় সময় পার করেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন! (স.স.)]।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে না সরকার

দেশের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা আপাতত নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে না সরকার। তবে মাদ্রাসার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নযরদারী অব্যাহত থাকবে।

এর আগে সিদ্ধান্ত ছিল কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে শিক্ষা আইনে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকবে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষাও সংযুক্ত করা হবে। পরিমার্জন আনা হবে চূড়ান্ত খসড়ায়। কিন্তু সম্প্রতি চূড়ান্ত হওয়া শিক্ষা আইনের খসড়ায় নিয়ম-কানূন আগের মতই রাখা হয়েছে। বাড়তি কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক বলেন, 'এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। নতুন করে কিছু সংযুক্ত করা হয়নি'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে উন্নয়নের কথা ভাবা হ'লেও মাদ্রাসা পরিচালনাকারীরা তা চান না। এ কারণে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কওমী মাদ্রাসাগুলোকে একটি কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেও তা আর হয়নি।

গত বছর ১৬ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত সংক্রান্ত বৈঠকে কওমী মাদ্রাসা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ঐ বৈঠকে অংশ নেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছিলেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

গত বছর ২১শে জুন দেশের সব মাদ্রাসা নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এরপর কওমী মাদ্রসাসহ সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ শুরু হয়। কওমী, নূরানী, ফোরকানিয়া ও ইবতেদায়ীসহ সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়।

ডাটাবেজ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে কওমী মাদ্রাসা আছে ১৯ হাযার ১৯৯টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। ২০১৫ সালে এ মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৩ হাযার ৯০২টি। গত পাঁচ বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ার পাশপাশি শিক্ষার্থীও বেড়েছে বলে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আমলারা জনপ্রতিনিধিদের গলায় রশি বেঁধে ঘোরান এবং ৯ সেকেণ্ডের কাজে ৯০ দিন লাগান

-পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান মন্তব্য করেছেন, আমলারা স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের গলায় রশি বেঁধে ঘোরান। গত ২৬শে জুন এক মতবিনিময় সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি নিজেও আমলা ছিলেন। অতিরিক্ত সচিব হিসাবে অবসরে গিয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন। বরাদ্দ পেতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বলা হয়, আগে নিজেদের ২০ টাকা আছে দেখাও, তাহ'লে ১০০ টাকা বরাদ্দ পাবে। এভাবে গলার মধ্যে নানা ধরনের রশি দেওয়া হয়।

মন্ত্রী বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যানকে সচিবালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিবের সঙ্গে দেখা করতে হ'লেও দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। তখন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সহজ-সরল পথে না গিয়ে ঘোরানো পথে যান। সচিবালয়ের বারান্দায় বা সচিবালয়ের বাইরে চায়ের স্টোরগুলোতে বসে আলোচনা হয়, দেন-দরবার হয়। সেখানে তারা (আমলারা) কিছু পান।

এছাড়া গত ২৯শে জুন এক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কিছু কিছু বিধি বা আমলাত্রিকতা অন্যায় এবং অমানবিক। যে কাজ নয় সেকেণ্ডে করা যায়, সে কাজে আমলারা ৯০ দিন লাগান। কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০ দিনের তিনগুণ সময়ও লাগান। তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে যে নিয়ম-কানূনগুলো আছে- তা কঠোর নয়। এখন সময় এসেছে আইন-কানূনে সংস্কারের। তিনি আরো বলেন, আমলাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে আইন-কানূন পরিবর্তন করা যাচ্ছে না দুষ্ট আমলাদের চাতুরির কারণে।

মন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের অনেক বিধি অপ্রয়োজনীয়। ব্রিটিশরা করে গেছে, যা এখনো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এগুলোর এখন কোন বাস্তবতা নেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে এসব বদলানোর, তা সত্ত্বেও অনেক দুষ্ট আমলাদের কারণে এসব পরিবর্তন করা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৩শে নভেম্বর'২১ রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এলডিসি গ্রাজুয়েশন সম্পর্কিত এক সংলাপে অংশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র থেকে ১০০ টাকা বরাদ্দ হ'লে তা ঠিকাদারের মাধ্যমে সাব-ঠিকাদারের হাতে যায়। সাব-ঠিকাদার আবার তার সাব-ঠিকাদারের হাতে দেয়। এভাবে নানা হাত বদলের মাধ্যমে ১০০ টাকা বরাদ্দ দিলে গ্রামে ১০ টাকা পৌঁছায়। সরকার এই বলয় ভেঙে ফেলতে নানাভাবে কাজ করছে।

[হক কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। বহু রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের ৫০ বছর পরেও সেই পুরানো গীত শুনতে হচ্ছে সচিব ও রাজনীতিকদের মুখে। যারাই রক্ষক তারাই যদি ভক্ষক হন, তাহ'লে দেশের উন্নতি কারা করবেন? আল্লাহ্র কাছেই রইল আমাদের ফরিয়াদ (স. স.)]।

বিদেশ

উগাণ্ডায় নতুন স্বর্ণখনি আবিষ্কার : মওজূদ প্রায় ১২ লাখ কোটি ডলারের স্বর্ণ!

পূর্ব আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশ উগাণ্ডায় একটি নতুন স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিটিতে যে পরিমাণ স্বর্ণের মওজূদ রয়েছে, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সেই স্বর্ণের মূল্য ১২ লাখ কোটি ডলার। চীনের খনি অনুসন্ধান ও আকরিক স্বর্ণ পরিশোধনকারী কোম্পানি ওয়াগাগাই উগাণ্ডার পূর্বাঞ্চলীয় শহর বুসিয়ায় এই স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছে বলে গত ৩রা জুলাই বিবৃতিতে জানিয়েছে উগাণ্ডার জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খনিটিতে অন্তত ৩ কোটি ১০ লাখ টন আকরিক স্বর্ণের মওজূদ রয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে শুরু হবে এই খনির স্বর্ণ উত্তোলন।

উগাণ্ডা বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা স্বর্ণ রফতানীকারক দেশগুলোরও একটি। একইসাথে বিশ্বের যেসব দেশের রাজনীতি চরমমাত্রায় অস্থিতিশীল, সেসবের মধ্যে উগাণ্ডা অন্যতম। দশকের পর দশকজুড়ে চলা গৃহযুদ্ধ ও জাতিগত সংঘাত দেশটির অর্ধেকেরও বেশী মানুষকে ঠেলে দিয়েছে চরম দারিদ্র্যের দিকে। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশের দৈনিক আয় মাত্র ১৭৭ টাকা।

[আল্লাহ্র এই বিশাল নে'মত পেয়েও যারা সবচেয়ে দারিদ্র্য পীড়িত, তাদের উচিৎ সর্বাগ্রে নিজেদের আত্মসমালোচনা করা। সেই সাথে আল্লাহ্র বিধান মেনে এই নে'মতের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের জীবন মানের উন্নতি করা। নইলে এই স্বর্ণখনিই তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ হবে (স. স.)]।

জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেল বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা জাতিসংঘের দাফতরিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন থেকে জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কিত সব তথ্য বাংলাতেও প্রকাশ করা হবে। গত ১০ই জুন এই প্রস্তাব পাশ হয়। এছাড়া হিন্দী ও উর্দুকেও সংযোজন করা হয়েছে। ইংরেজী, ফরাসী, রুশ, ম্যাণ্ডারিন, আরবী ও স্প্যানিশ- এই ছয়টি ভাষায় এ পর্যন্ত জাতিসংঘের সব লিখিত এবং মাল্টিমিডিয়ায় প্রকাশিত বার্তা প্রচারিত হ'ত। এবার সেখানে যুক্ত হ'ল বাংলা, উর্দূ ও হিন্দী। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা বিশ্বের সপ্তম ভাষা। বিশ্বের ৩৩ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা।

[আলহামদুলিল্লাহ! এটি একটি বড় অর্জন। সেই সাথে বলব, দেশের আদালতগুলির ভাষা ইংরেজীর বদলে বাংলা করুন! (স. স.)।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভারতে সাড়ে চার দিনেরও কম সময়ে ৭৫ কি.মি. রাস্তা তৈরীর অনন্য নযীর

অবিশ্বাস্য কম সময়ে ভারতে ৭৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। সেই রাস্তার সুবাদে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)। ভারতের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি এ খবর জানিয়েছেন। এত দীর্ঘ পথ এত কম সময়ে তৈরির করার নযীর বিশ্বে নেই।

ভারতের মহারাষ্ট্রের আকোলা ও অমরাবতী যেলার মাঝখানে ৭৫ কিলোমিটার পথ নির্মাণ করা হয়েছে সাড়ে চার দিনেরও কম সময়ে। এ দীর্ঘ পথ তৈরি করতে নির্দিষ্টভাবে ১০৫ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট সময় লেগেছে বলে উল্লেখ করেছেন নিতিন। ৮০০ থেকে ১০০০ কর্মী নির্মাণ কাজে শ্রম দিয়েছে। বিটুমিন কংক্রিটের তৈরি এই রাস্তা দু'টি লেনের একটি পূর্ণাঙ্গ রাস্তার একাংশ। এ রাস্তা তৈরি করতে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এর আগে এত তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা তৈরির গিনেস-রেকর্ড কাতারের কাছে ছিল। কাতারের দোহায় ১০ দিনে ২৫ কিলোমিটার একটি রাস্তা তৈরির গিনেস রেকর্ড রয়েছে।

[আমাদের প্রশ্ন, বাংলাদেশ কেন এটা পারে না? বলা হয়, এদেশে ১ কি.মি. রাস্তা করতে যে খরচ, পৃথিবীর কোন দেশেই তত খরচ হয় না। এই বদনাম আর কত দিন শুনতে হবে? (স. স.)]।

সংগঠন সংবাদ

যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২২

রাসূল (ছাঃ) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রমনা, ঢাকা ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় রাজধানীর রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতি। তিনি যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। তিনি ভারতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তির বিরুদ্ধে এবং সেদেশে বিক্ষোভ প্রতিরোধের নামে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্মম প্রতিশোধ নীতির বিরুদ্ধে চলতি সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছদের মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বাধাদান রোধ ও তাদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের সভা-সমিতিতে বাধা না দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বেক্সিমকো শিল্প গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান বলেন, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে এবং তার আখলাক বা চরিত্রের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিরক-বিদ'আতের মত ধর্মীয় কুসংস্কার এবং মাদক ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে বগুড়া কারাগারে সাক্ষাতের নানা দিক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা প্রায় দু'বছর পর এখানে একত্রিত হ'তে পেরেছি। এই ভাইরাস দুনিয়াবী সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর কোন রাষ্ট্রকেও ছাড় দেয়নি। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা কত বেশি!

তিনি আরো বলেন, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গীরা ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে। ইসলাম জঙ্গীবাদকে কখনও সমর্থন করেনা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সম্মিলিতভাবে তাঁর সাথে কাজ করলে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গীবাদ নির্মুল করা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে দু'টি মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু আমি রাফউল ইয়াদয়েন করে ও জোরে আমীন বলে ছালাত আদায় করি। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলি। তাই আপনাদেরও উচিত পড়াশুনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

আমরা আজ নবী (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করিনা। তাঁর আদর্শের অনুসরণ করলে সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যেত। আমরা যদি আমাদের আখলাককে সুন্দর করি তাহ'লে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান পাব ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে চিনতাম না। বগুড়া কারাগারে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। ৬ দিন ৭ রাত আমি সেখানে থেকেছি। তিনি প্রতিদিন ফজরের ছালাতের পর দারস দিতেন। ইসলাম সর্ম্পকে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। অন্য আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি তার সঠিক সমাধান পাইনি। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করে আমি সবগুলোর সঠিক সমাধান পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে সর্বাগ্রে স্ব স্ব ক্ষেত্রে 'আদর্শ' হ'তে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকার মাদারটেক মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, আত-তাহরীক টিভির প্রোগ্রাম পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, 'আল-'আওন'-এর সভাপতি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ফায়ছাল মাহমূদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুর রঊফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক ও বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা কলেজের সভাপতি হাফেয নাজমুছ ছাকিব ও হাফেয আব্দুল আলীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) ও রাকীবুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

দেশের সরকার ও প্রশাসনের প্রতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে সমর্থন করেন।-

১. ৯০% মুসলিমের দেশ হিসাবে এদেশের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে নারীদের পর্দা পালনে বাধা সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাসহ ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহ দূর করার জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে।

৪. কোটা নয়, মেধাভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং দক্ষ, নিরপেক্ষ ও সৎ জনপ্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে ছেলে ও মেয়েদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫. সূদী ও মহাজনী দাদন প্রথা এবং অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৬. যুবচরিত্র রক্ষার্থে বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহ থেকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে যত্রতত্র মাদকের সয়লাব রোধে কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. জঙ্গীবাদের ভয়ংকর থাবা থেকে ধর্মপ্রাণ যুবসমাজকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং জঙ্গীবাদের উস্কানীদাতাদের চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নামে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে কোনভাবেই হয়রানী করা যাবে না।

৮. এ সম্মেলন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠায় বাধাদান ও ভাঙচুর করা, সভা-সমিতিতে বাধাদান এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে নতুন আহলেহাদীছদের নিরাপত্তাদান এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম অবাধে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছে।

৯. এ সম্মেলন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. ভারত, মিয়ানমার, চীন, সিরিয়া, ইয়ামন, কাশ্মীর, ফিলিস্তীনসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতন বন্ধে সরকারীভাবে জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১. অত্র সম্মেলন ভারতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তির বিরুদ্ধে চলতি সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে ভারতে বিক্ষোভ প্রতিরোধের নামে মুসলমানদের বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্মম প্রতিশোধ নীতির বিরুদ্ধে অত্র সম্মেলন তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

১২. এই সম্মেলন যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সরকারের নিকট শিক্ষার সর্বস্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর 'সীরাত' পাঠকে বাধ্যতামূলক করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

১৩. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

১৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ী ও মওজূদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. পদ্মাসেতুসহ দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে এই সম্মেলন কৃষিবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করে কৃষি অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর

কর্মী উপস্থিতি : দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় তিন হাযার কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামসহ পৃথকভাবে বাহিরে প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়। উল্লেখ্য, অডিটোরিয়াম কর্তৃপক্ষ মূল গেইট খুলে দিতে গড়িমসি করায় অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয় এবং সকাল ৯-টার অনুষ্ঠান ১১-টায় শুরু করতে হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারারাত জেগে ঢাকায় সম্মেলনে আসা কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সকালে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। এরপরও তারা কোন রকম বিশৃংখলা না করে পূর্ণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সম্মেলন সফল করেন।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে সকাল ১১-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে মূল গেইটের বারান্দায় 'আল-'আওন' কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন-এর পরিচালনায় উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ জাহিদ প্রমুখ। এ সময় ঢাকা-দক্ষিণ, ঢাকা-উত্তর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও পাবনা যেলা থেকে আগত আল-'আওন-এর যেলা দায়িত্বশীলগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৫ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও মূল গেইটের দু'পার্শ্বে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠন পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জি, চাবির রিং, স্লিপিং প্যাড ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

[উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের রিপোর্ট ১৯.০৬.২০২২ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ২য় পৃষ্ঠার ১ম কলামে ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

আন্দোলন

বানভাসী মানুষের পাশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

মে মাসের প্রথম দফা বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় তলিয়ে যায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেলা সিলেট ও সুনামগঞ্জ। লাগাতার প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্টি হয় এই বন্যা। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষ। পানির তোড়ে ভেসে যায় হাস-মুরগী, গবাদীপশু ও পুকুরের মাছ। তলিয়ে যায় ফসলের মাঠ। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে বিগত শত বছরেও

অত্রাঞ্চলের মানুষ এরকম বন্যা দেখেনি। একইভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর ও নেত্রকোনায়ও ভয়াবহ বন্যা আঘাত হানে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিবারের ন্যায় এবারও সাধ্যমত বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বেশ কয়েক দফায় ত্রাণ ও সাহায্য নিয়ে অসহায় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছে। ত্রাণের পাশাপাশি দিয়েছে সান্ত্বনা, উপদেশ দিয়েছে ছবরের এবং আহ্বান জানিয়েছে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত এবং তাক্বওয়াপূর্ণ সুন্নাতী জীবন-যাপনের। বিস্তারিত নিম্নরূপ-

১. সিলেট ও সুনামগঞ্জ

চলতি বছর মে মাসের শেষের দিকে সিলেটে বন্যা দেখা দিলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যেলার বিভিন্ন থানার প্রত্যন্ত গ্রামে কয়েক দফা ত্রাণ বিতরণ করে *(রিপোর্ট: জুলাই সংখ্যা দ্রষ্টব্য)*। অতঃপর জুনের মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় আরো ভয়াবহ আকারে বন্যা আঘাত হানলে 'আন্দোলন' সাধ্যমত সার্বক্ষণিক বানভাসী মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে।

(১) ১৯শে জুন রবিবার : বন্যার পানিতে শহরের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়ায় তীব্র খাবার পানির সংকট দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সিলেট মহানগর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' শাহজালাল উপশহরের বি, ই ও ডি ব্লকের ৫০টি পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ খাবার পানির ২০লিটারের বড় জার বিতরণ করে। মহানগর 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল খালেক, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি গোলাম আযম ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারের সদস্য আরমান প্রমুখ দায়িত্বশীলগণ বৃষ্টিতে ভিজে এবং হাঁটু ও কোমর পানিতে নেমে এই বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করেন।

(২) ২০ ও ২১শে জুন সোম ও মঙ্গলবার : তীব্র বন্যার কারণে সিলেটে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশে কুমিল্লা থেকে শুকনা খাবারের প্যাকেট ও মিনারেল ওয়াটার নিয়ে কুমিল্লা ও সিলেট যেলা নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট উপযেলার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়। জৈন্তাপুরের সেনগ্রাম ও সারিঘাট; কানাইঘাটের গোয়ালজুর, বাঁশবাড়ী ও ফাগু এবং গোয়াইনঘাট উপযেলার কাফাউড়ার মোট ৯৪৫টি পরিবারের মধ্যে শুকনা খাবার ও খাবার পানি বিতরণ করা হয়। দু'দিনব্যাপী এই ত্রাণ বিতরণে সিলেট যেলা নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কুমিল্লা থেকে যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক জাফর ইকরাম, বুড়িচং উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক যহীরুল ইসলাম, দেবিদ্বার উপযেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক যহীরুল ইসলাম, বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ও প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(৩) ২২ ও ২৩শে জুন বুধ ও বৃহস্পতিবার : ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সুধী ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর অর্থায়নে এবং সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সার্বিক সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ যেলার তাহেরপুর উপযেলাধীন রামজীবন, নয়নগর, ইকরামপুর, নয়াগাঁও, মাড়ালা, শ্রীপুর ও উজান তাহিরপুর গ্রামের ৯০০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ওলী হাসান, 'আন্দোলন' ঢাকা যেলার সুধী ও ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ আরমান, কাওছার আহমাদ, আব্দুল হান্নান, শফী আহমাদ ও সিলেট যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি গোলাম আযম ও অর্থ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ উক্ত ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) ২৩ শে জুন বৃহস্পতিবার : সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে শহরের তালতলা এলাকার পানিবন্দী ৪০টি পরিবারের মধ্যে শুকনা খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল খালেক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আব্দুল হাফীয এ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

(৫) ২৫ ও ২৬শে জুন শনি ও রবিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও নরসিংদী যেলার অর্থায়নে সিলেট ও সুনামগঞ্জ যেলার ৯৯৫টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। নরসিংদী থেকে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট প্রস্তুত করে দু'টি মিনি ট্রাকে করে সিলেট ও সুনামগঞ্জ শহরে রাতেই পৌঁছানো হয়। অতঃপর ২৫শে জুন সুনামগঞ্জ যেলা সদর থেকে ট্রলারে করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একাধিক হাওর পার হয়ে তাহেরপুর উপযেলার দুর্গম এলাকায় অসহায় মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেয়া হয়। উপযেলার উজান তাহেরপুর, মধ্য তাহেরপুর, রায়পুর, সূর্যেরগাঁও, লক্ষ্মীপুর, ভাটি তাহেরপুর, শ্রীপুর, মন্দিরহাতা, মাটিয়াল ও আনোয়ারপুর গ্রামের পানিবন্দী মোট ৪৭০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পরদিন ২৬শে জুন রবিবার সিলেট যেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার বর্ণী, পূর্ব বর্ণী, পশ্চিম বর্ণী, বর্ণী হাওর, বর্ণী কান্দিবাড়ী, গৌরী নগর; গোয়াইনঘাট উপযেলার, কাফাউড়া, ভিত্রিখেল হাওর পশ্চিমপাড়া, ভিত্রিখেল হাওর পূর্বপাড়া, ভিত্রিখেল, হাওর মধ্যপাড়া এবং জৈন্তাপুর উপযেলার হাজারী সেনগ্রামের বন্যাদুর্গত মোট ৫২৫টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দুই দিনে সর্বমোট ৯৯৫টি পরিবারের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

দুইদিন ব্যাপী এই ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে কেন্দ্র থেকে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও দারুল অহী আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাদল মিয়া, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুযযামান, যুববিষয়ক সম্পাদক হেমায়েত হোসাইন, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ওলী হাসান, সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক শাব্বীর আহমাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল হাফীয, যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

২য় দিন ত্রাণ বিতরণ শেষে রাত ৯-টায় সিলেট শহরস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীতে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ত্রাণ বিতরণে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান এবং সকলের জন্য দো'আ করেন। এ সময় তিনি জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক।

(৬) ২রা জুলাই শনিবার : সুনামগঞ্জ যেলার শান্তিগঞ্জ উপযেলার সলফ পূর্ব ও পশ্চিমপাড়া, নবীনগর, কছদ্দরপুর, অরিনগর ও দিরাই উপযেলার সিকন্দরপুর গ্রামের ৩২০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং ১০০ পরিবারের মধ্যে নগদ ৭৫,০০০/= (পঁচাত্তর হাযার) টাকা বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণে সিলেট যেলা নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর ওলী হাসান, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক, প্রচার সম্পাদক আহসান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(৭) ২রা জুলাই শনিবার : সিলেট যেলার কানাইঘাট উপযেলার ফাগু ও বাঁশবাড়ী এলাকার বন্যাদুর্গত ১৭৫টি পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও ৫০টি পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ করা হয়। ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহযোগিতায় এই ত্রাণ

বিতরণ করা হয়। সিলেট যেলা নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক ফযলুল হক, যুববিষয়ক সম্পাদক সারওয়ার জাহান, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ উক্ত ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

(৮) ৩রা ও ৪ঠা জুলাই রবি ও সোমবার : সুনামগঞ্জ যেলার তাহেরপুর উপযেলার নতুনহাটি, বিরজল, সোনাপুর, নেয়ামতপুর, তেরঘর, মাটিহাটি, রতনশ্রী ও উজান তাহেরপুর গ্রামের ৩০২টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাযার) টাকা বিতরণ করা হয়।

পরদিন ৪ঠা জুলাই **মৌলভীবাজার** যেলার কুলাউড়া উপযেলার তিলকপুর, ফরিদপুর, মীরশংকর, ঘাটের বাজার, সোনাপুর, ভেহালা ও কুলাউড়া পৌরসভার ২০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উক্ত দুই দিনের ত্রাণ বিতরণে সিলেট ও মৌলভীবাজার যেলা নেতৃবৃন্দের সাথে কুমিল্লা থেকে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য হারুণ ইবনে রশীদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ, দেবিদ্বার উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জুবাইদুল আলম প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

২. কুড়িগ্রাম

(১) ২৮শে জুন মঙ্গলবার : কুড়িগ্রাম যেলার উলিপুর উপযেলাধীন মোল্লারহাট ও চর ঘুঘুমারি এলাকার বন্যার্তদের মাঝে 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মুন্সিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর আর্থিক সহযোগিতায় ৩৫০টি পরিবারের মধ্যে এই ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়। কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক, মুন্সিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও দারুল হাদীছ আইডিয়াল একাডেমী, মিরপুর, ঢাকার পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ উক্ত ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

(২) ৫ই জুলাই মঙ্গলবার : কুড়িগ্রাম যেলার রাজারহাট উপযেলাধীন গতিয়াসাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বন্যার্তদের মাঝে 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অত্রাঞ্চলের ৩১০টি বন্যার্ত অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এ সময়ে কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যদের মধ্যে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, রংপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুকছেদুর রহমান, রংপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুন নূর ও সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৩. নেত্রকোনা

কলমাকান্দা ৩০ জুন বৃহস্পতিবার : দুপুর ১২-টায় যেলার কলমাকান্দা উপযেলাধীন নলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এলাকার বন্যার্ত মানুষের মাঝে ৫৮৪ প্যাকেট বন্যাত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

৪. নীলফামারী

নীলফামারী-পূর্ব ২৪শে জুন শুক্রবার : যেলার জলঢাকা থানাধীন মৌজা শৌলমারী গ্রামের ২৭০টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণে কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, নীলফামারী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ফযলুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বন্যার্তদের মাঝে কুরবানীর গোশত বিতরণ

সিলেট ১০ই জুলাই রবিবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সিলেট যেলার বন্যাদুর্গতদের মাঝে কুরবানীর গোশত বিতরণ করা হয়। ঈদুল আযহার দিন যেলার জৈন্তাপুর উপযেলার সেনগ্রামে ১টি, কানাইঘাট উপযেলার ফাগু-বাঁশবাড়ীতে ১টি এবং গোয়াইনঘাট উপযেলার কাফাউড়া ও ভিত্রিখেলে ২টি গরু কুরবানী করে দুস্থ ও অসহায় বন্যার্তদের মাঝে গোশত বিতরণ করা হয়। সেনগ্রামে ৪৭, ফাগু-বাঁশবাড়ীতে ৫০ এবং কাফাউড়া ও ভিত্রিখেলে ২২৫ সর্বমোট ৩২২টি পরিবারের মধ্যে এই গোশত বিতরণ করা হয়।

সুনামগঞ্জ ১০ই জুলাই রবিবার : যেলার শান্তিগঞ্জ উপযেলার সলফ গ্রামের ৮০টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ১টি গরু কুরবানী করে গোশত বিতরণ করা হয়।

গাইবান্ধা ১০ই জুলাই রবিবার : যেলার সাঘাটা উপযেলার পশ্চিম পবনতাইর গ্রামের ৩৬টি পরিবারের মধ্যে একটি ছাগল কুরবানী করে বিতরণ করা হয়।

কুড়িগ্রাম ১১ই জুলাই সোমবার : যেলার উলিপুর উপযেলাধীন বেগমগঞ্জ গ্রামের বন্যাদুর্গতদের মাঝে ১টি গরু কুরবানী করে গোশত বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সেখানে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মোট ১৬৫টি পরিবারের মধ্যে এই গোশত বিতরণ করা হয়।

সার সংক্ষেপ : চলতি বছরের মে মাসের বন্যায় প্রথম দফায় সিলেটে ৮৮৫ পরিবারে খাদ্যসামগ্রী ও ৬৫ পরিবারে ৬৫ বাণ্ডিল টিন বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় এ পর্যন্ত সিলেটে ১৬১০, সুনামগঞ্জে ১৯৯২, মৌলভীবাজারে ২০০, কুড়িগ্রামে ৬৬০, নেত্রকোণায় ৫৮৪, নীলফামারীতে ২৭০, সর্বমোট ৫৩১৭ পরিবারে খাদ্যসামগ্রী, ৬০৩টি পরিবারে কুরবানীর গোশত ও ২০০ পরিবারে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

উল্লেখ্য যে, বিতরণকৃত খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে চাউল ৫ কেজি, আটা ২ কেজি, মসুর ডাল ১ কেজি, আলু ২ কেজি, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, সরিষা/সয়াবিন তেল অর্ধ কেজি, মরিচ/গুঁড়া ১০০ গ্রাম, গুঁড়া হলুদ ১০০ গ্রাম। মোট ১২ কেজি ৭০০ গ্রাম। সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অনেক সময় বাধ্য হয়ে কমবেশী করতে হয়েছে।

['আন্দোলন'-এর ৬৬টি সাংগঠনিক যেলার প্রায় সব ক'টি থেকে এবং প্রবাসী শাখা সমূহ থেকে, সেইসাথে বিভিন্ন সুধী ও শুভাকাংখীদের প্রেরিত দান সমূহ বন্যাত্রাণ কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়। আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি (স.স.)]।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : আমলে শিরক থাকলে কি ঈমান বাতিল হবে?

-নাছরুল্লাহ, নরসিংদী।

উত্তর : আমলে বড় শিরক থাকলে তার ঈমান ও আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। যেমন আল্লাহ্র ইবাদতে শিরক করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এটা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, সে ব্যক্তি দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল *(নিসা ৪/১১৬)*। তিনি বলেন, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তিনি আরো বলেন, 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সকল আমল অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : আমার স্বামী প্রবাসে থাকে। আমার শাশুড়ী, বৃদ্ধ শ্বশুর ও আমি বাড়িতে থাকি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে তেল মালিশ করে দিতে হয়। এই সুযোগে আমার শ্বশুর আমার শরীরে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি স্বামীকে জানালে সে বিশ্বাস না করে গোপনে তার ভিডিও ধারণ করতে বলে। আমি ভিডিও করে পাঠালে সে বিশ্বাস করে এবং জনৈক আলেমের ফৎওয়ার দারস্থ হয়। তারা ফৎওয়া দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে তালাক হয়ে গেছে। এক্ষণে আমাদের সংসার করার কোন সুযোগ আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : উক্ত জঘন্য কাজের জন্য শ্বশুর কবীরা গুনাহগার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাতের যেনা হ'ল স্পর্শ করা *(মুসলিম হা/২৬৫৭, মিশকাত হা/৮)*। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য কোন নারীকে অবৈধভাবে স্পর্শ করার চেয়ে তার মাথায় লৌহ সুচ দ্বারা খোঁচা খাওয়া বরং উত্তম *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২২৬)*। তবে শ্বশুর ছেলের স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ছেলের সাথে উক্ত স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হারাম যৌন সম্পর্ক হালাল সম্পর্ককে হারাম করে না *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৩৯৬০; ইরওয়া হা/১৮৮১, সনদ ছহীহ)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, কোন লোক যেনায় লিপ্ত হ'লে তার মেয়ে বা মায়ের সাথে হালাল সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা নেই *(কিতাবুল উম্ম ৭/২০৬)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, কোন অবৈধ সম্পর্ক বৈবাহিক হালাল সম্পর্ককে হারাম করবে না *(আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১২০)*। প্রশ্ন অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই উক্ত বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রয়েছে। অতএব তারা যথারীতি সাংসারিক জীবন অব্যাহত রাখবে।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে রক্ত দেয়, পরবর্তীতে তিনি ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারবেন কি না?

-খায়রুল ইসলাম, সরাইল, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : রক্ত গ্রহণ বা প্রদান কাউকে মাহরাম সাব্যস্ত করে না। অতএব কাউকে রক্ত দান করে থাকলে তা বিবাহ বন্ধনের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/২৮৫-৮৬)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাতী আদব সমূহ কি কি? মাথা দুলিয়ে পড়া বিদ'আত কি?

-যহূরুল ইসলাম, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের কতিপয় আদব হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা *(আবুদাঊদ হা/১৭; নাসাঈ হা/৩৮; মিশকাত হা/৪৬৭; ছহীহাহ হা/৮৩৪)*। মিসওয়াক করা *(ইবনু মাজাহ হা/২৯১; ছহীহাহ হা/১২১৩)*। ক্বিবলামুখী হওয়া *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। তেলাওয়াতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা *(নাহল ১৬/৯৮; শারহুল মুমতে' ৩/৩৩০)*। বিনম্রভাবে তেলাওয়াত করা *(বনু ইসরাঈল ১৭/১০৯)*। রহমতের আয়াত আসলে তা চাওয়া এবং আযাবের আয়াত আসলে তা হ'তে পানাহ চাওয়া *(মুসলিম হা/৭৭২; আবূদাঊদ হা/৮১৫; নাসাঈ হা/১৬৬৪)*। তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বস্তু দূরে রাখা, হাই তোলার সময় তেলাওয়াত বন্ধ রাখা *(উলূমুল কুরআন মিন খিলালে মুক্বাদ্দামাতিত তাফাসীর, ২/১৯৭)*। সুন্দর কণ্ঠে তারতীল ও তাজবীদসহ তেলাওয়াত করা *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪; বুখারী হা/৫০২৪,৫০৪৫-৪৬;)*। বড় অপবিত্রতায় কুরআন স্পর্শ না করা *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮০; মিশকাত হা/৪৬৫)*। তন্দ্রা অবস্থায় তেলাওয়াত না করা *(মুসলিম হা/৭৮৭; আবূদাঊদ হা/১৩১১; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭২)* ইত্যাদি। আর কুরআন তেলাওয়াতের সময় কিছুটা দুলুনী আসতে পারে। আদব বিনষ্ট না হ'লে সামান্য দুলুনীতে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : খোলাফায়ে রাশেদীন দ্বারা বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কী?

-মেহেদী হাসান, নাটোর।

উত্তর : সঙ্গত কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম। **প্রথমতঃ** তারা খেলাফত, যুদ্ধ ও উম্মতের যরূরী বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনায় মনোযোগ দিতে পারেননি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বড় বেশী হাদীছ বর্ণনা করে। (জেনে রাখ) কিতাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, 'আমরা কিতাবের মধ্যে মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ সমূহ বিবৃত করে নাযিল করার পরও যারা সেগুলিকে গোপন করে, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহ ও লা'নত করেন সকল

লা'নতকারীগণ'। 'তবে যারা তওবা করে ও সংশোধন করে নেয় এবং সত্য প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের তওবা কবুল করব। বস্তুতঃ আমি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-৬০)*। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনছার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগূল থাকত। আর আবু হুরায়রা (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে লেগে থাকতেন। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং তারা যা মুখস্থ করত না তা তিনি মুখস্থ রাখতেন *(বুখারী হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৮৯৬)*।

দ্বিতীয়তঃ তারা হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন ওমর (রাঃ) সাক্ষী ব্যতীত কোন হাদীছই গ্রহণ করতেন না *(ইবনু কুতায়বা, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ ৯১-৯২ পৃ.)*।

তৃতীয়তঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগ হওয়ায় তারা কুরআনের সাথে হাদীছের সংমিশ্রণ কিংবা হাদীছের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণের আশংকা করতেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'সাবধান! তোমরা আমার পক্ষ থেকে অধিকহারে হাদীছ বর্ণনায় সতর্ক হও। যদি কেউ আমার সম্পর্কে কোন কথা বলে, সে যেন সঠিক ও সত্য কথা বলে। কেননা কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫; ছহীহাহ হা/১৭৫৩)*।

চতুর্থতঃ তারা অনেক হাদীছ জানতেন। কিন্তু তাদের ব্যস্ততার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করার সুযোগ পাননি। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তারাও হাদীছ বর্ণনা করতেন। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ফিৎনার সময়, নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে মতভেদের সময় আবুবকর (রাঃ)-ই হাদীছ বর্ণনা করে সমাধান করেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৭/৩৬৭)*।

পঞ্চমতঃ তারা অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা হাদীছ হিসাবে নয় বরং অধিকাংশ ফৎওয়া হিসাবে এসেছে। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, সঙ্গত কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা কম।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের কারণে তাকে এক সাথে তিন তালাক দেই। দফায় দফায় সালিশ হওয়ায় একপর্যায়ে ৩ মাসের মধ্যে আমি তাকে নতুন করে বিবাহ ও কাবিন করে ফিরিয়ে আনি। এমতাবস্থায় আমি ৩ বছর যাবৎ সংসার করে আসছি। কিন্তু মানুষের মুখে বিভিন্ন কথা শুনে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। এক্ষণে আমার সংসার জীবন শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি?

-মুহাম্মাদ আলী, পাবনা।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; আবুদাঊদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নালোকে ইদ্দতের মধ্যে নতুন বিবাহের প্রয়োজন ছিল না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১২৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৩৪৬)*। বরং এ সময় স্ত্রীকে রাজ'আত করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল। তবে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী মিলন করায় তা রাজ'আত হিসাবে গণ্য হবে। অতএব বর্তমান সংসার জীবন শরী'আত সম্মত *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৫২৩; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/৭৫)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : টয়লেটের মধ্যে বসে মোবাইলে কথা বলা যাবে কি?

-ফাইয়ায মোর্শেদ, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় কথা বলা অপসন্দনীয়। সে হিসাবে মোবাইলেও কথা বলা থেকে বিরত থাকবে *(নববী, আল -মাজমূ' ২/৮৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/৩৪)*। তবে যরূরী কোন কারণ দেখা দিলে বা প্রয়োজন পূরণরত অবস্থায় না থাকলে মোবাইলে বা সরাসরি কথা বলা জায়েয *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১১/১৭১)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : একজন আলেমের কি কি গুণাবলী দেখে তার নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করা উচিৎ?

*-*মানিক ছিদ্দীক, ঢাকা।*

[শুধু 'ছিদ্দীক' নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : একজন আলেমের মধ্যে ন্যূনতম নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তার নিকট থেকে ইলম অর্জন করা বা ফৎওয়া নেওয়া যাবে। (১) আল্লাহভীরু হওয়া (২) দলীল সহকারে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ থাকা (৩) কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সিদ্ধান্তের কাছে নিরংকুশভাবে আত্মসমর্পণের মানসিকতা থাকা (৪) নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী নীতির অনুসারী হওয়া (৫) সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া (৬) হিকমত বা প্রজ্ঞা থাকা (৭) হক-এর উপর দৃঢ় থাকা (৮) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং ইলম অনুযায়ী আমল করা (৯) নিজের বিরুদ্ধে হ'লেও সর্বদা ইনছাফের সাথে হক কথা বলা। (১০) ইখলাছ থাকা প্রভৃতি *(দ্র. উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৬৪/১৮)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : জনৈক বক্তা হাদীছে কুদসীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইবাদতগুযার যুবকের প্রশংসা করে ফেরেশতাদের বলেন, দেখ আমার বান্দার দিকে, সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। হে যুবক তুমি আমার নিকট কিছু ফেরেশতার মর্যাদাতুল্য'-উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আবেদ আলী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি বানোয়াট বা জাল *(আলবানী, যঈফাহ হা/৩১১৩; যঈফুল জামে' হা/১৬৮২)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পশুর

চামড়া রান্না করে খাওয়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যবহকৃত হালাল পশুর চামড়া, পা ইত্যাদি হালাল অংশ কেউ চাইলে রান্না করে খেতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যা অহি করা হয়েছে, তাতে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৪৫)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : বিতরের কুনূত একাকী পড়ার সময় বাংলায় বা আরবীতে অতিরিক্ত দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

-আব্দুল খালেক, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত দো'আ পাঠের পর আরবীতে অতিরিক্ত দো'আ পাঠ করা যায় *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৯৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ৭৭৮, ১৪/১৩৭ পৃ.)*। ছাহাবীগণ বিতরের কুনূতে অতিরিক্ত দো'আ পাঠ করেছেন *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৯৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১০০)*। তবে এ সময় আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা হ'তে বিরত থাকাই শরী'আতসম্মত *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : পিতা সন্তানদের কোন সম্পদ না দিয়ে সব কিছু মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করতে চান। কিন্তু ছেলেরাও সবাই কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে। এমতাবস্থায় পিতার জন্য এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইউসুফ, কক্সবাজার।

উত্তর : এমন কাজ করা পিতার জন্য জায়েয হবে না। বরং সন্তানদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ যদি তার সম্পদ দান করতেও চায় তাহ'লে সে তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারবে। জনৈক ছাহাবীকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিছগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে কোন ব্যয়ই কর না কেন, তা ছাদাক্বারূপে গণ্য হবে' *(বুখারী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৩০৭১)*। কা'ব বিন মালেকের তওবা কবুল হ'লে তিনি তার সমুদয় সম্পদ ছাদাক্বা করে দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে' *(বুখারী হা/২৭৫৭)*। তবে কারো যদি ওয়ারিছ না থাকে বা ওয়ারিছদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহ'লে তিনি তার সমুদয় সম্পদ দান করে দিতে পারেন। যেমন আবুবকর (রাঃ) দান করেছিলেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৩/২৯৫; মির'আত ৬/৩৬৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১০২)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ইস্তেখারাহ কি? নিজের কোন বিষয়ে অন্য কেউ ইস্তেখারাহ করতে পারবে কি? না নিজের বিষয় নিজেকেই করতে হবে?

-শরীফুল ইসলাম, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখারাহ' বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার আশায় বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করবে। এজন্য ফরয ছালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু'রাক'আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়। ইস্তেখারার দো'আ সালাম ফিরানোর পরে বা আগে পড়া যায় *(বুখারী হা/১১৬২; আবুদাঊদ হা/১৫৩৮; মির'আত ৪/৩৬২, হা/১৩৩২-এর আলোচনা)*। অন্যান্য ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো'আ সমূহ করতেন *(নাসাঈ হা/১১৬৩)*। সে হিসাবে ইস্তেখারাহ্র দো'আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬৩ পৃ.)*। ইস্তেখারার ছালাত নিজেকেই আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কেউ কারু পক্ষ থেকে ছিয়াম বা ছালাত আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫; ত্বাহাভী, শরহ মুশকিলুল আছার ৬/১৭৬; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/২৯৩০)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : পাত্রী দেখার সময় পাত্র, পাত্রীর শরীরের কতটুকু অংশ দেখতে পারবে?

-মুস্তাক্বীম আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পাত্র পাত্রীর মুখমণ্ডল, কব্জি সহ দুই হাত ও গোড়ালী সহ দুই পা দেখতে পারে। এভাবে পাত্রীও পাত্রকে দেখতে পারে *(ইবনু রুশদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ৩/৩১)*। এছাড়া উভয়ে উভয়কে যেকোন বৈধ মাধ্যমে যাচাই করতে পারে *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৯৯)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : রাসূল (ছাঃ) তার স্ত্রীদের ঘরের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন কি?

-আলী আলম, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীদের ঘরের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গৃহস্থালির কাজ করতেন। অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর আযান হ'লে তিনি ছালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন *(বুখারী হা/৬৭৬; মিশকাত হা/৫৮১৬)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতায় তালি লাগাতেন ও কাপড় সেলাই করতেন। তিনি বাড়ীর কাজ করতেন যেমন তোমরা করে থাক' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪৪০)*। তিনি বলেন, 'তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড়ের উকুন নিজে বাছাই করতেন। বকরী দোহন করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন' *(শামায়েলে তিরমিযী হা/৩৪৩; মিশকাত হা/৫৮২২; আহমাদ হা/২৬২৩৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৮৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : আমি ধান চাষ করার জন্য ২ বিঘা জমি ৪০ হাযার টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়েছি। উক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের মূল্য দিয়েও যদি ভাড়ার টাকা পরিশোধ না করা যায়, তারপরেও কি ওশর দিতে হবে?

-আহসান হাবীব, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : ওশর হ'ল ফসলের যাকাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ফসল উৎপন্ন করবে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে তাকে ফসলের ওশর বা নিছফে ওশর দিতে হবে। চাই তা ভাড়া জমি থেকে হোক বা নিজের জমি থেকে হোক *(বাক্বারাহ ২/২৬৭; আন'আম ১৪১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/৩০)*। কেবল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হ'লে দশভাগের একভাগ এবং সেচের পানিতে হ'লে বিশভাগের একভাগ *(বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭)*। এক্ষণে কেউ ব্যবসার কৌশলে ভুল করলে তাকেই তার খেসারত দিতে হবে। শরী'আতের বিধানে কোন পরিবর্তন আসবে না।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : এশার ছালাতের পর ৪ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে ক্বদরের ছালাতের ন্যায় ছওয়াব পাওয়া যায় কি?

-হাসানুয্যামান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এশার ছালাতের পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা *(বুখারী হা/১১৬৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯)*। এরপরে বাড়িতে গিয়ে কেউ চাইলে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৯৬)*। উল্লেখ্য যে, এই চার রাক'আত ছালাত বিশেষ কোন ছালাত নয় এবং এশার ছালাতের সাথেও সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এটি তাহাজ্জুদের ছালাতের অংশ হিসাবে গণ্য *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৯৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার খালা নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে এক রাতে ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ)ও সেই রাতে সেখানে ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) জামা'আতে এশার ছালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে গেলেন এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন *(বুখারী হা/১১৭; মুসলিম হা/৯০১)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত চার রাক'আত ছালাতের ফযীলতে বলা হয়েছে যে, তা ক্বদর রাতের ছালাতের সমতুল্য *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫১-৭৩৫৭; মারওয়াযী, মুখতাছার ক্বিয়ামুল লায়েল হা/১৯২)*। উক্ত মর্মে বর্ণিত মারফূ হাদীছগুলোর সবই অত্যন্ত 'যঈফ'। তবে প্রায় একই মর্মে ছহীহ সূত্রে আয়েশা, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর সহ বেশ কিছু ছাহাবী থেকে মওকূফ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় আলবানী (রহঃ) বলেন, এই আমলের ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাটি মারফূর পর্যায়ভুক্ত *(যঈফাহ হা/৫০৬০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব কেউ চাইলে এশার ছালাতের পরে একই সালামে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : একাকী ঘরের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিংবা স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘ সময় সতর উন্মুক্ত অবস্থায় যদি থাকে তবে তা জায়েয হবে কি?

-ছালেহীন, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : একাকী নির্জন ঘরে থাকার সময়ও বিনা কারণে সতর খুলে রাখা ঠিক নয় *(মুসলিম হা/৩৪১; মিশকাত হা/৩১২২)*। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সামনে সতর উন্মুক্ত রাখতে পারে *(মুমিনূন ২৩/৫-৬; বুখারী হা/২৯৯-৩০০)*। বাহয বিন হাকীম তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের (গোপনাঙ্গ) কি গোপন করব, আর কি বর্জন করব? তিনি বললেন, তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হেফাযত কর। ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা এক জায়গায় থাকলে? তিনি বললেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা দেখতে না পায়। ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি নির্জনে থাকে? তিনি বললেন, মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ লজ্জা করার বেশী হকদার *(আবুদাউদ হা/৪০১৭; ছহীহুল জামে' হা/২০৩)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নফল ছিয়াম বা অন্য কোন আমল আছে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, বেড়া, পাবনা।

উত্তর : দো'আ ও ছাদাক্বার মাধ্যমে জটিল রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করা যায়। নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীন দো'আর মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা নিতেন। যেমন হযরত আইয়ূব (আঃ) দীর্ঘ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে বলেন, (রাব্বি ইন্নী মাস্সানিয়ায যুর্রু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহেমীন) 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কষ্টে পড়েছি। আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছাদাক্বা দ্বারা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭৪৪)*। অর্থাৎ ছাদাক্বা দাও। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন কর। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যার ঔষধ নাযিল করেননি' *(বুখারী হা/৫৬৬৮; মিশকাত হা/৪৫১৪)*। অতএব দো'আ ও ছাদাক্বার মাধ্যমে আত্মিক চিকিৎসা নিবে এবং উপযুক্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে দৈহিক চিকিৎসা গ্রহণ করবে। সর্বোপরি আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে এবং মানসিকভাবে শক্ত থাকবে। কারণ আল্লাহই আরোগ্য দানের মালিক।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : জুম'আর দিন খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ২ রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। এক্ষণে ওয়াজিব বাদ দিয়ে ২ রাক'আত ছালাত আদায় না করে খুৎবার পর ২ রাক'আত ছালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়াই কি সুন্নাত সম্মত হবে না?

-শরীফুল ইসলাম, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করাও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তাই জনৈক ব্যক্তি খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসার নির্দেশ দেন *(মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, পিতা-মাতা মারা গেলেও তারা জীবিত ছেলে-মেয়েদের পাপের ভাগীদার হবে এবং কবরে শাস্তি পাবে। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-রণি হোসাইন, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।*

**[শুধু 'হোসাইন' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : সন্তানের পাপের ভার পিতা-মাতাকে বহন করতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের দ্বারা নিজেকেই দায়বদ্ধ করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৪)*। তবে যদি পিতা-মাতা কোন পাপের সূচনা করে যান এবং সন্তানেরা সেই পাপকর্ম করতে থাকে, তাহ'লে সেই পাপের বোঝা পিতা-মাতাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা বশে বিভ্রান্ত করেছে *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : চারিত্রিক হেফাযতের জন্য আমার বিবাহের প্রয়োজন। কিন্তু নিজের ও পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় এবং পিতা-মাতাও এ ব্যাপারে উদাসীন। এক্ষণে নিজেকে পাপ থেকে রক্ষার জন্য আমার করণীয় কি?

-ইমন, ময়মনসিংহ।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : বিবাহ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা এটা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়ামই তার প্রবৃত্তি দমনকারী' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৮০)*। এক্ষণে ব্যক্তি সুস্থ ও কর্মক্ষম হ'লে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। এজন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়া শর্ত নয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৬)*। বরং কেউ গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিবাহ করতে চাইলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ' *(নূর ২৪/৩২)*। এক্ষণে কেউ আর্থিকভাবে একেবারে অপারগ হ'লে ছিয়াম পালন করে যেকোন মূল্যে নিজের চরিত্র রক্ষা করবে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যারা এদের বাইরে কাউকে কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ২৩/৭)*। এর মধ্যে পায়ুমৈথুন, হস্তমৈথুন সহ সকল প্রকার অন্যায় যৌনাচার নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : প্রবাসী স্বামী বছরের পর বছর আমাকে ছেড়ে প্রবাসে রয়েছেন। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে আমি দারুণভাবে বিপর্যস্ত। আমার অধিকার নষ্টের কারণে স্বামী কি গোনাহগার হবেন? এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আয়েশা আখতার, বিহাস, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ... তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। অতএব প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর' *(বুখারী হা/১৯৭৫, ৬১৩৯)*। স্ত্রীর হক আদায় না করার কারণে স্বামী গুনাহগার হবেন। তবে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে একাধিক বছর স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে পারবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/০২)*। এক্ষেত্রে পরিবারের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে স্ত্রীকে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত চার মাস বা সর্বোচ্চ ছয় মাসের অধিক সময় বাইরে থাকে এবং স্ত্রীর হক আদায়ে সচেষ্ট না হয়, তাহ'লে স্ত্রী চাইলে তালাক প্রার্থনা করতে পারে বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ৫/১৯৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৬২-৬৩; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/২১২)*। এ ব্যাপারে স্বামী যেন কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা টালবাহানার আশ্রয় না নেয়। আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে তোমরা ক্ষতি করার জন্য আটকে রেখ না, তাহ'লে তোমরা সীমালংঘন করবে। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে তার নিজের উপর যুলুম করল' *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : কন্যা শিশু বিছানায় পেশাব করার পর তা শুকিয়ে গেলে তার উপর শয়ন করলে শরীর নাপাক হয়ে যাবে কি? আর উক্ত বিছানা না ধুয়ে তার উপর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আসাদুযযামান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : পেশাবে সিক্ত বিছানা ভালোভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর তাতে শয়ন করলে কাপড় বা দেহ নাপাক হবে না *(ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৪৮/১৮; ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ১/১৯৪)*। কিন্তু নাপাক বিছানায় শুয়ে ঘেমে গেলে এবং পেশাবযুক্ত বিছানাকে সিক্ত করলে দেহ নাপাক হবে *(হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ৩/৩০)*। ছালাতের জন্য স্থান পবিত্র হওয়া শর্ত। অতএব পেশাবযুক্ত বিছানার উপর আলাদা কাপড় বা মুছাল্লা বিছিয়ে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া ওয়াদ দুরূস ৮/২)*। তবে সর্বাবস্থায় অধিকতর পবিত্র স্থানে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৫৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমার স্ত্রী মনের দিক দিয়ে ভালো। কিন্তু রেগে গেলে অসহনীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং আমাকে বাপ-মা তুলে গালি দেয়। সে চায় আমি বাপ-মা থেকে পৃথক থাকি। কিন্তু আমি তা চাই না। আমাদের একটা মেয়ে সন্তান আছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-সুজায়েত তাযীম, বেনাপোল, যশোর।

উত্তর : এজন্য স্ত্রীকে অধিকহারে নছীহত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তমভাবে নছীহত কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে।

আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নছীহত করতে থাক' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মিশকাত হা/৩২৩৮)*। নছীহতে সমাধান না হ'লে বাড়ীতে বিছানা আলাদা করবে। এরপরেও সংশোধন না হ'লে হালকা প্রহার করবে। এতেও সমাধান না হ'লে উভয় পক্ষের দু'জন শালিশ নিযুক্ত করবে, যারা মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহ'লে তাদের জন্য অন্য কোন পথ তালাশ করো না। আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন' *(নিসা ৪/৩৫)*। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা ছওয়াবের কাজ এবং সেটি স্বামীর আনুগত্যের অংশ।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : মহিলারা সুগন্ধিযুক্ত নারিকেল তেল মেখে বাইরে যেতে পারবে কি?

-মুনতাহা, আটোয়ারী, পঞ্চগড়।

উত্তর : মহিলারা কোন সুগন্ধি বা সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করে বাইরে বের হ'তে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জেনে রাখো যে, পুরুষদের খোশবূ এমন যাতে সুগন্ধি আছে, রং নেই। আর নারীদের খোশবূ এমন যাতে রং আছে, সুগন্ধি নেই' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। তিনি আরো বলেন, 'পুরুষেরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে সুগন্ধি মেখে কোন মহিলা যদি পুরুষদের মাঝে গমন করে, তাহ'লে সে একজন ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে' *(নাসাঈ হা/৫১২৬; আহমাদ হা/১৯৭২৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : ভবিষ্যতে মাদ্রাসা করার লক্ষ্যে এখন থেকে নিয়মিতভাবে নিজের ও অন্যদের যাকাত, দান-ছাদাক্বা, ওশর ইত্যাদি নির্দিষ্ট একাউন্টে জমা রাখতে পারব কি?

-ইউনুস আকন্দ, ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা, কমিটি গঠন, যৌথ হিসাব খুলে ও ছক নির্ধারণ করে দ্বীনী খেদমতের উদ্দেশ্যে অর্থ আদায় করা যায়। তবে যাকাতের টাকা জমা রাখা যাবে না। কারণ এর নির্ধারিত খাত রয়েছে।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আমরা জানি, মেঘের উপরে থাকে পজিটিভ চার্জ আর নীচে থাকে নেগেটিভ চার্জ। যেহেতু বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই এই পজিটিভ চার্জ ও নেগেটিভ চার্জ পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে উপর থেকে নীচের দিকে চার্জের নির্গমন ঘটে। এর ফলে শক্তির নিঃসরণ ঘটে, শব্দ হয় ও আলোর ঝলকানি সৃষ্টি হয়। কিন্তু হাদীছে (তিরমিযী হা/৩১১৭) এই শব্দকে ফেরেশতাদের হাকডাক বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ হাকডাক দিয়েই মেঘমালাকে নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

-রেযওয়ানুল হক, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা বিচ্ছিন্ন মেঘমালাকে একত্রিত করার জন্য আগুনের চাবুক দিয়ে আঘাত করে তখন যে চার্জ সৃষ্টি হয় তাতেই গর্জন ও আলো বিচ্ছুরিত হয়। আবার ফেরেশতারা যখন মেঘমালাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখনও তাদের হাতে থাকা চাবুক দিয়ে আঘাত করে। ফলে বিপরীতধর্মী চার্জ সৃষ্টি হয় এবং তাতেই বজ্রপাত এবং আলো বিচ্ছুরিত হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৬৩-৬৪ ; মির'আত ৫/২০৭; মিরক্বাত ৩/১১১৯)*। আলোর গতি তুলনামূলক বেশী হওয়ায় পৃথিবীতে আলোর আগমন ঘটে আগে এবং শব্দের আগমন ঘটে পরে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করে, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে গর্জন শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে ফেরেশতার মেঘমালাকে আঘাত করে তাড়ানোর গর্জন। এভাবে আঘাত করে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় *(তিরমিযী হা/৩১১৭; ছহীহাহ হা/১৮৭২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বজ্রধ্বনি সৃষ্টিকারী হ'লেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেষপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২২)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : আমি ওমরাহতে যেতে চাই। আমার ফ্লাইটের তারিখ ও সময় নির্ধারিত। কিন্তু ঐ তারিখেই আমার হায়েয শুরু হয়ে যাবে। আমার করণীয় কি?

-সাদিয়া, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ক্ষতির আশংকা না থাকলে হায়েয বন্ধের জন্য ওষুধ সেবন করতে পারে। জনৈক মহিলা ওষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করার ব্যাপারে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২১৯-২০ কাশশাফুল কেনা' ১/২১৮)*। এক্ষণে কারো যদি ওষুধ সেবন করা সম্ভব না হয় তাহ'লে ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং পবিত্র হ'লে ইহরাম বেঁধে ওমরাহর কার্যাবলী সম্পাদন করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩৫১)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : মাঠে পুরো দিন কাজ করার জন্য একজন লোক নিয়োগ করার পর অর্ধদিবস কাজ করে সে বাড়ি চলে গেল। এক্ষণে অর্ধদিবস কাজ করার জন্য সে কোন মজুরী পাবে কী? বাকী অর্ধদিবস কাজ না করার কারণে যদি মালিকের ক্ষতি হয় তাহ'লে লোকসান বহন করবে কে?

-আল-আমীন, ভুগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী কর্মচারী যে অনুপাতে কাজ করবে সে অনুপাতে মজুরী পাবে। তবে কর্মচারী যদি

গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত ও মালিকের অনুমতি ব্যতীত চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ দিবস কাজ না করে এবং তাতে মালিকের ক্ষতি হয়, তাহ'লে কর্মচারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/১৮৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : কিছুদিন আগে আমার ছোটভাই ১ মাস বয়সে মারা যায়। আমার বোন স্বপ্নে দেখতে পায়, আমার মৃত ভাইটি তার কাছ থেকে নতুন কাপড় চাচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা ও করণীয় কি?

-আশিকুর রহমান, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : এক্ষেত্রে কিছুই করণীয় নেই। এজন্য কোনরূপ ছাদাক্বা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যেসব স্বপ্ন ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়, সেগুলি মনের কল্পনা মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষের স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) কষ্টদায়ক স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় (গ) মনের কল্পনা, যা স্বপ্নে দেখা যায় *(মুসলিম হা/২২৬৩)*। তবে রাসূল (ছাঃ) অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতেন *(বুখারী হা/৭০৪৬; মুসলিম হা/২২৬৯; মিশকাত হা/৪৬২২)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : আমার প্রিয় কোন ব্যক্তি যেন কল্যাণের মধ্যে থাকেন ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকেন সেজন্য নফল ছিয়াম ও ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ছিদ্দীক, জুরাইন, ঢাকা।

উত্তর : কারো কল্যাণের জন্য ছিয়াম বা ছালাত আদায় করা যাবে না *(মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫)*। বরং প্রিয় ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য দো'আ করতে হবে। আর এ দো'আ 'ছালাতুল হাজত' শেষেও করা যায়। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য কোন মুসলিম দো'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত একজন ফেরেশতা থাকে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কোন মঙ্গলের দো'আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন। আর তোমার জন্যও অনুরূপ' *(মুসলিম হা/২৭৩৩)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সালাফগণ যখন নিজের জন্য দো'আ করার ইচ্ছা করতেন, তখন একই দো'আ আগে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য করতেন। যাতে তার জন্য উক্ত দো'আ কবুল করা হয় *(শরহ মুসলিম ১৭/৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : স্থায়ীভাবে রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমি খুব হতাশা বোধ করি। জনৈক আলেম বলেন, রোগ-ব্যাধির কারণে গুনাহখাতা মাফ হয়। একথার সত্যতা আছে কি?

-সুলতান, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : একথা সঠিক। মুমিনের রোগ-ব্যাধি হ'লে সেটি তার গুনাহের কাফফারা হয়। যেমন (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমানের কোন বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট হয় না, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটাও বিদ্ধ হয় না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৫৩৭)*। (২) তিনি বলেন, 'মুমিন নর-নারীর জীবনে এবং তার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে' *(তিরমিযী হা/২৩৯৯ 'বিপদে ধৈর্যধারণ' অনুচ্ছেদ)*।

(৩) মহিলা ছাহাবী উম্মুল 'আলা বলেন, একবার আমি পীড়িত হ'লে রাসূল (ছাঃ) আমাকে দেখতে এসে (সান্ত্বনা দিয়ে) বলেন, 'হে 'আলার মা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আগুন যেভাবে সোনা-রূপার ময়লা ছাফ করে দেয়, সেইরূপ মহান আল্লাহ রোগের মাধ্যমে মুসলিম বান্দার পাপগুলোকে দূর করে দেন' *(আবুদাঊদ হা/৩০৯২; সিলসিলা ছহীহাহ/৭১৪)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন মুসলিমকে দৈহিক রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি ফেরেশতাকে বলেন, বান্দা যে নেক আমলগুলি নিয়মিত করত, সেগুলির নেকী তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। অতঃপর আল্লাহ যদি তাকে আরোগ্য দান করেন, তাহ'লে তাকে গুনাহ থেকে ধুয়ে-মুছে ছাফ করে দেন। আর যদি তাকে মৃত্যু দান করেন, তাহ'লে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন' *(আহমাদ হা/১৩৭১২; মিশকাত হা/১৫৬০)*। (৫) তিনি বলেন, 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহ'লে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে' *(বুখারী হা/২৯৯৬, মিশকাত হা/১৫৪৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : কোন নারীকে জোর করে ধর্ষণ করা হ'লে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে কী? আর ধর্ষণের কারণে পেটে বাচ্চা চলে আসলে উক্ত বাচ্চা নষ্ট করা যাবে কী?

-আমীনুল ইসলাম, লালমাই, কুমিল্লা।

উত্তর : এক্ষেত্রে উক্ত নারী অত্যাচারিতা ও নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। জনৈক পুরুষ একজন নারীকে ধর্ষণ করলে তাদেরকে উভয়কে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আনা হ'লে তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি ঐ ধর্ষণকারী পুরুষকে রজম করার আদেশ দেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৭৯; তিরমিযী হা/১৪৫৪, মিশকাত হা/৩৫৭২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৬/১৮৭)*।

আর ধর্ষণের ফলে পেটে বাচ্চা চলে আসলে এবং চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হ'লে তা নষ্ট করা যাবেনা *(ইবনু রজব, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৫৭, ১৬১; ফাৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৪৫০)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : আশূরার ছিয়াম কি নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। তিনি কি অত্যাচারী কওম থেকে মুক্তি লাভের শুকরিয়া স্বরূপ তা পালন করতেন?

-রাকীবুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : না। একথা সঠিক নয়। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/৮৭০২, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া হিসাবে মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে পালিত হয় *(বুখারী হা/৪৭৩৭; মুসলিম হা/১১৩০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : ওমরাহ করার ক্ষেত্রেও কি মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেটে ফেলা আবশ্যক? উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম?

-রেযাউল করীম, তারাগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : হজ্জ ও ওমরাহ উভয় ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত চুল খাটো করা ওয়াজিব *(বুখারী হা/১৭২৯; মুসলিম হা/১৩০১; মিশকাত হা/২৬৩৬)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূল-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে। তোমাদের কেউ মস্তক মুণ্ডনকারী হিসাবে ও কেউ চুল খাটোকারী হিসাবে...' *(ফাৎহ ৪৮/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের দিন হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য দু'বার, অন্য বর্ণনায় তিনবার এবং চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দো'আ করেছিলেন *(বুঃ মুঃ, মিশকাত হা/২৬৪৮-৪৯)*।

মাথা মুণ্ডন ও চুল ছাঁটার মধ্যে কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্বান মাথা মুণ্ডনকেই উত্তম বলেছেন। কেননা কুরআনে মাথা মুণ্ডনকে আগে আনা হয়েছে *(ফাৎহ ৪৮/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দো'আ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/১৯৯; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৩/৫৬৪)*। তাছাড়া মুণ্ডনকারী আল্লাহ্র জন্য নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করার অনুভূতি লাভ করেন *(মির'আত ৯/২৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : শরী'আত নির্ধারিত দণ্ড যেমন যেনার শাস্তি, বেত্রাঘাত, হস্তকর্তন ইত্যাদি শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে আল্লাহ তা'আলা কি পুনরায় শাস্তি দিবেন?

-রূহুল আমীন, ফরিদপুর।

উত্তর : ইসলামী আদালত কর্তৃক উক্ত দণ্ড কার্যকর হ'লে পরকালীন শাস্তির জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে *(বুখারী হা/১৮; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : নখ লম্বা করে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-যুবায়ের আহমাদ, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : নখ লম্বা রাখা যাবে না। এটি নবীগণের সুন্নাতের বিরোধী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষের স্বভাবগত আমল হ'ল ৫টি (১) নাভির নীচের লোম ছাফ করা (২) খাৎনা করা (৩) গোফ ছেঁটে ফেলা (৪) বগলের লোম ছাফ করা (৫) নখ কাটা *(বুখারী হা/১২৫৭)*। অনেকে বগলের লোম হাত দিয়ে উঠিয়ে ফেলার কষ্ট স্বীকার করেন। অথচ ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেললেও উঠিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য হাছিল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭২২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : শরী'আতে মৃত ব্যক্তির নামের শেষে (রহঃ) যোগ করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মাপকাঠি আছে কি? যেকোন মৃত মুসলিমের নামের শেষে 'রহেমাহুল্লাহ' যোগ করা যাবে কি?

-ওমর ফারূক, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যে কোন নেককার মৃত মুসলিম ব্যক্তির নামের শেষে 'রহেমাহুল্লাহ' (আল্লাহ তার প্রতি দয়া কর) বলা যাবে। এটি বান্দার জন্য অপর বান্দার দো'আ। তবে ইসলামী পরিভাষায় সকল নবীর নামের শেষে 'আলাইহিস সালাম' (আঃ) বলা হয়। কিন্তু শেষনবীর নামের শেষে 'ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (ছাঃ) বলা হয়। একইভাবে ছাহাবায়ে কেরামের নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' (রাঃ) এবং পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ-মুজতাহিদ এবং সালাফ ওলামায়ে কেরামের নামের শেষে 'রহেমাহুল্লাহ' (রহঃ) দো'আ সূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা মর্যাদাগত পার্থক্য বুঝানো হয়। অতএব যেকোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির নামের শেষে (রহঃ) যুক্ত না করাই উত্তম। তাতে পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ থেকে পার্থক্য করা সহজ হয়।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী... দো'আটি ছালাতের কোন কোন স্থানে পড়া যাবে?

-আল-আমীন, পোতাহাটী, ঝিনাইদহ।

উত্তর : উক্ত দো'আটি ছানা হিসাবে তাকবীরে তাহরীমার পর পড়া যাবে *(মুসলিম হা/৭৭১; মিশকাত হা/৮১৩)*। এটাকে এদেশে 'জায়নামাযের দো'আ' বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পাঠ করা হয়। যা ভুল।

শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করুন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২০২২ সাল থেকে এসএসসি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় বাদ দেওয়ার প্রস্তাবে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একথা বলেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এযাবৎ গঠিত ৭টি শিক্ষা কমিশনের প্রতিটিতেই 'ইসলামী শিক্ষা' সংকোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী জনতার দিকে তাকিয়ে কোন সরকারই তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং উল্টা বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের অপচেষ্টায় ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী 'বিবর্তনবাদ' ২০১২ সাল থেকে স্কুল-কলেজে এবং ২০১৩ সাল থেকে মাদ্রাসা সমূহের সিলেবাস ভুক্ত করা হয়েছে। সকল মহল থেকে হাযারো প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার আজও এই 'বানরবাদী' বিষয় সিলেবাস থেকে প্রত্যাহার করেনি। ইতিমধ্যে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ১০০ নম্বর থেকে ৫০ নম্বরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এখন সেটি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত ২৩ শে জুন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' (এনসিটিবি)-র প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 'ইসলামী শিক্ষা'কে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলা হ'লেও এটি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকবে কি না, সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তিনি বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, অনতিবিলম্বে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়কে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ঘোষণা দিন। সাথে সাথে 'বিবর্তনবাদ'কে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার সিলেবাস থেকে প্রত্যাহার করুন!

(দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ই জুলাই'২২, ৮ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	০২ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	০৪ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৭	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৫ আগস্ট	০৬ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	০৮ মুহাররম	২৩ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	১০ মুহাররম	২৫ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১০	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	১২ মুহাররম	২৭ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:১২	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৭:৫৬
১৩ আগস্ট	১৪ মুহাররম	২৯ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	১৬ মুহাররম	৩১ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২
১৭ আগস্ট	১৮ মুহাররম	০২ ভাদ্র	বুধবার	০৪:১৫	০৫:৩৪	১২:০২	০৩:২৯	০৬:৩০	০৭:৫০
১৯ আগস্ট	২০ মুহাররম	০৪ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:১৬	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
২১ আগস্ট	২২ মুহাররম	০৬ ভাদ্র	রবিবার	০৪:১৭	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৬
২৩ আগস্ট	২৪ মুহাররম	০৮ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:১৮	০৫:৩৬	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৫	০৭:৪৪
২৫ আগস্ট	২৬ মুহাররম	১০ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২
২৭ আগস্ট	২৮ মুহাররম	১২ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২০	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২২	০৭:৩৯
২৯ আগস্ট	০১ ছফর	১৪ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২১	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	০৩ ছফর	১৬ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২২	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৩৫
০১ সেপ্টেম্বর	০৪ ছফর	১৭ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	০৬ ছফর	১৯ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩২
০৫ সেপ্টেম্বর	০৮ ছফর	২১ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	১০ ছফর	২৩ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	১২ ছফর	২৫ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	১৪ ছফর	২৭ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২৩
১৩ সেপ্টেম্বর	১৬ ছফর	২৯ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	১৮ ছফর	৩১ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	-১	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০	-১	০
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-১	+১	+৪	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	-২	০	+২	+১	+২
জামালপুর	-১	+২	+৪	+৩	+৪
নেত্রকোণা	-৪	-১	+১	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৪	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+৩	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৩	+৩
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২	+১
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১	০
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	-১	-১	-২
পটুয়াখালী	+৩	০	-২	-২	-৩
পিরোজপুর	+৪	+২	০	০	-১
বরিশাল	+২	০	-১	-১	-২
ভোলা	+১	-১	-৩	-২	-৩
বরগুনা	+৪	+১	-১	-১	-২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৪	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৬	+৫	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৭	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৮	+৮	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+৯	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৭	+১২	+১০	+১৩
দিনাজপুর	+৩	+৭	+১১	+৯	+১১
লালমণিরহাট	-১	+৪	+৮	+৬	+৮
নীলফামারী	+২	+৬	+১০	+৯	+১১
গাইবান্ধা	০	+৩	+৬	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৮	+১২	+১০	+১২
রংপুর	০	+৪	+৮	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	-১	+৩	+৭	+৫	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩	-৪	-৪
ফেনী	-২	-৪	-৫	-৫	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৫	-৭	-৯	-৯	-১০
নোয়াখালী	-১	-৩	-৪	-৪	-৫
চাঁদপুর	০	-১	-২	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	০	-২	-৩	-৩	-৪
চট্টগ্রাম	-৩	-৬	-৮	-৮	-৯
কক্সবাজার	-২	-৬	-১০	-৯	-১১
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৭	-৭	-৮
বান্দরবান	-৪	-৭	-১০	-৯	-১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৮	-৬	-৪	-৫	-৪
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৪	-৫	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৩	-৩
সুনামগঞ্জ	-৭	-৪	-১	-২	-২

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

যেলা ভিত্তিক ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার (সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

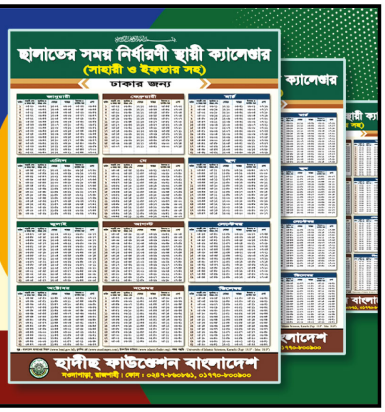

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 11, August 2022

আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়ুন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

কর্মী সম্মেলন ২০২২

২৫ ও ২৬শে আগস্ট | স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার | উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭